প্রতিদিন
২৬ অক্টোবর ২০০৮
রোববার
অন্তরমহল
সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

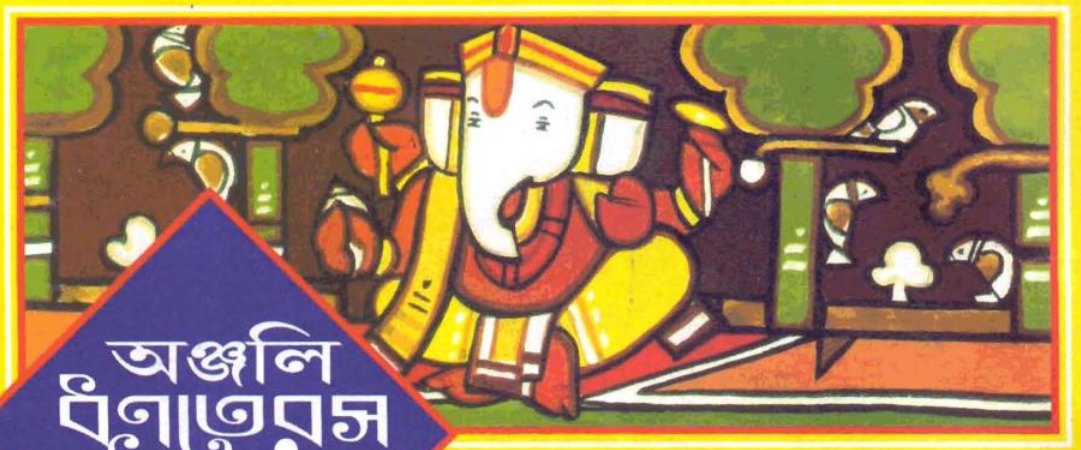

অঞ্জলি ধনতেরস উৎসব

সম্পদকে আলিঙ্গন করুন
অঞ্জলির ধনতেরস উৎসবে।
জিতে নিন ফাটাফাটি উপহার!
শুধুমাত্র ২ দিনের জন্য !!

৬টি ল্যাপটপ, ১২টি সোনার পেনড্যান্ট,
১২টি মাইক্রোওয়েভ, ১২টি জুসার,
১২টি ইস্তিরী, ১২টি হেয়ার ড্রায়ার
এবং প্রতি কেনাকাটায় আরো অনেক অনেক উপহার (লাকি ড্র-এর মাধ্যমে)

Mayurakshi/107/08

গয়নার মজুরীতে ৫০% অবধি ছাড়।
এছাড়াও রয়েছে গ্রহরত্নের উপর ১০% ছাড় !

রয়েছে মেহেন্দীর আয়োজন

শুধুমাত্র ২৬ ও ২৭শে অক্টোবর

© অঞ্জলি জুয়েলার্স®
সবার জন্য

গোলপার্ক - ২৮এ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা ২৯, ফোন - ২৪৪০ ১৭৯২/২৪৬০ ০৫৮১
শোভাবাজার - ৩৮ অরবিন্দ সরণী, শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের পাশে, কলকাতা ৫, ফোন - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক - বি. ই. ১০১, কোয়ালিটি মোড়, কলকাতা ৬৪, ফোন - ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬
সল্টলেক - এইচ. এ. ৩, জিডি আইল্যান্ডের পাশে, কলকাতা ৯৭, ফোন - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ৫২২ সি ডায়মন্ডহারবার রোড, স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে, কলকাতা ৩৪, ফোন - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫
হাওড়া - ১০৫ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, পঞ্চাননতলা, হাওড়া ৭১১ ১০১, ফোন - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।

*শর্তাবলী প্রযোজ্য

সব দোকান মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকবে।

www.anjali.bz

২৬ অক্টোবর ২০০৮

রোববার

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

লেটারবক্স
পাঠকের পাতা ৪

ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬

ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ৮

এবার মলাট
অন্তরমহল
জয়া মিত্র ১২
গলায় দড়ি
আশাপূর্ণা দেবী ২০
জীবনখাতা ২৬

রোববারের রামপ্রসাদী
আয় মন বেড়াতে যাবি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ২৮

রোববারের মেগা
ঝিলডাঙার কন্যা
প্রচেত গুপ্ত ৩৪

সেন সলিউশনস
রাইমা সেন ৩৮

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ
জিশান-এর চিকেন কোর্মা ৪০

সৌজন্য -
মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
ছবি সৌজন্য
দে'জ পাবলিশিং
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
ভাস্কর লেট
রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার
শান্তনু দে
সন্তোষ দত্ত
সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

ওহ্ জেরুজালেম

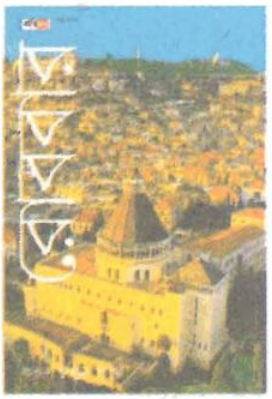

ঋতুদার লেখা 'করুণ রঙিন পথে' পড়লাম ও আধুনিক জেরুজালেম শহরকে পেলাম একটু অন্য রূপে অন্য সাজে। যিশুখ্রিস্টর জীবনে নিন্দনীয় অত্যাচারের কথা তো আমরা সবাই জানি। সাক্ষী হয়ে আছে এই ঘটনা ইতিহাসে। দেশজুড়ে যখন এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়, বড়দিন পালন হয়, গুড ফ্রাইডে হয়, তখন জেরুজালেম শহর কতটা ভাবে, যিশুকে নিয়ে? তারই প্রতিচ্ছবি পেলাম সদ্যভ্রমণকারী ঋতুদার কলমে। যাঁকে নিয়ে দেশজুড়ে নানা আলোচনা, যে জায়গাকে নিয়ে আলোচনার শেষ হয় না, সেই জায়গায় নাকি আতর, তামাকের গন্ধে ভর্তি। সেখানে নাকি যিশুর রক্তের অশ্রু অনুভব করা যায় না। এইসব জল্পনা শুনে মনে হয়, ইতিহাস এখনও অবহেলিত।

সুরজিৎ শীল হাওড়া

গল্পচ্ছলে লেখা

'করুণ রঙিন পথে' পড়ে যেন ইজরায়েল ঘুরে এলাম আপন মনোরথে। আমার অন্যতম প্রিয় লেখক-চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে ইজরায়েল বেড়িয়ে আমার মন্দ লাগল না। বিদেশ বলতে ভুটানে একবার গিয়েছি। বার চারেক গিয়েছি বাংলাদেশে। ওই পর্যন্তই! তাই ভ্রমণ বিষয়ক কোনও লেখা পেলে যেন গোগ্রাসে গিলতে থাকি। বিশেষ করে রোববার-এর পাতা হলে তো সোনায় সোহাগা, যেন সেখানে মনের স্থায়ী আসন পাতা হয়ে যায়! 'পেপার ভিসা' কী ও কেন—তাও জানা গেল গল্পচ্ছলেই। সাতসকালে 'রয়াল জর্ডানিয়ান ছাড়ার আগেই, ব্রেকফাস্ট করিয়ে নিয়ে বিমানসেবিকা জানলা বন্ধ করে, গায়ে কম্বল টেনে দিয়ে যখন গুড নাইট জানায়, তখন সত্যিই এক অনাস্বাদিতপূর্ণ অনুভূতি যেন ছড়িয়ে পড়ে সারা তনুমনে। মায়ের সর্বত্র সস্নেহ উপস্থিতি লেখাটিকে যেন এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। অতি শৈশবে মাতৃহারা এই পত্রলেখকের মনের কোনও এক দুর্বলতম অংশের কোমল ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে 'ফার্স্ট পার্সন'।

সুদিন বিশ্বাস উত্তর চব্বিশ পরগনা

মায়ের উপস্থিতি

ঋতুপর্ণ ঘোষের 'করুণ রঙিন পথে' পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দীর্ঘ লেখাটির প্রথম পর্যায়ে লেখকের মায়ের নিভৃত উপস্থিতির মাঝে আমি যেন আমার হারিয়ে যাওয়া মায়ের সত্তাকে খুঁজে পেলাম। অনুভূতির বিচারে লেখার বিন্যাস আমার হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি। 'কেবল ঘুমের মধ্যে টের পেলাম, কে যেন সরে যাওয়া কম্বলটা গায়ে সযত্নে টেনে দিচ্ছে। কষ্ট করে চোখ খুলে নীল কাফতানকে ধন্যবাদ দিতে যাব—দেখি মা।' মায়ের কোনও বিকল্প নেই। মাতৃভক্তির নিখাদ সম্পদ না থাকলে কেউ বড় হতে পারে না। এবারের 'ফার্স্ট পার্সন' কোনও দীর্ঘ নিবন্ধ নয়, যেন এক মমতাভরা কবিতা, যা ইজরায়েলের বুক ছুঁয়ে জীবনের বৃত্তে ঘুরপাক খায়। অনাবিল আনন্দপ্রাপ্তির পাশাপাশি সম্পাদকের বলিষ্ঠ লেখাটি অন্যতম সম্পদ বলে আমার মনে হল। মনে মনে করুণ রঙিন পথে কখন যে ইজরায়েল ঘুরে এলাম জানি না।

বিপ্লব সেনগুপ্ত উত্তর চব্বিশ পরগনা

হৃদয়ছোঁয়া লেখা

'করুণ রঙিন পথে' সংখ্যায় নবনীতা দেবসেনের 'আলো অন্ধকারের রূপকথা' হৃদয় ছুঁয়ে গেল। মনে হল, কোনও উপন্যাসের অংশ পড়ছি। বাস্তবটা যদি সত্যিই এমন হয়, তবে তা ছবি হয়ে ভেসে উঠল এই লেখার ভিতর। আমাদের চারপাশে এমন কত পাগলি, ভিখিরি ছিন্ন পোশাকে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। ওদের তো একটা অতীত আছে! মাতৃত্বে আলোর স্থিরতা, সুস্থতা ও পারিবারিক সহযোগিতা সর্বোপরি আলোর মেয়ের যোগ্য মানুষ হয়ে ওঠার ভিতর দিয়ে মন যেন একটা সান্ত্বনা খুঁজে পায়—দু'টো প্রাণ তো সুস্থ স্বাভাবিক হল! ভবঘুরে হয়ে আর হারিয়ে তো গেল না! এটাই পরমপ্রাপ্তি। মায়ের স্নেহের বন্ধনে আলোর যেন আলোয় ফেরা। সমস্ত কলঙ্ক যেন ফিকে হয়ে যায় 'ভালো-বাসার বারান্দা'য়। কারণ মা শুধু বোঝে স্নেহ আর ভালবাসা।

সনৎ ঘোষ হাওড়া

রঙিন পথ

'করুণ রঙিন পথে' সংখ্যাটি পড়ে আমার অতৃপ্ত মন তৃপ্ত হল। কারণ প্রায় দেড় বছর ধরে রোজই ভেবেছি 'ফার্স্ট পার্সন' যদি আর একটু বড় হত। পড়তে বসলেই ফুরিয়ে যায়, অথচ জিজ্ঞাসু মন তৃপ্ত হয় না। তাই এবার ঋতুপর্ণ ঘোষ মন ভরিয়েছেন এবং শেষে 'চলবে' দেখে সামনের রোববারও মন ভরবে আশা করেছিলাম। তবে নবনীতা দেবসেনের 'ভালো-বাসার বারান্দা'য় 'আলো অন্ধকারের রূপকথা' পড়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। যাইহোক, আলোর মেয়ে ডাক্তার হয়ে শতশত দরিদ্রের সেবা করে অথবা মনহারাদের মন ফিরিয়ে দিয়ে প্রমাণ দেবে এ পৃথিবীর পথ করুণ হলেও রঙিন।

শম্পা মান্না হাওড়া

ছেঁড়া নোটের তুল্য

আমাদের সমাজে বা পরিবারে যে কোনও মহিলা মানসিকভাবে দুর্বল হলে তাকে নিয়ে ছেঁড়া নোটের মতো ব্যবহার করি কেন? যেনতেনপ্রকারেণ তার সদ্‌গতি করতে আমরা সদাব্যস্ত হই। অথচ ভাবি না প্রয়োজনে ওই ছেঁড়া নোট কত দামি। লেখিকা নবনীতা দেবসেনের লেখনীকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। 'আলো অন্ধকারের রূপকথা' শীর্ষক রচনাটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের ঘরের কথা। আলোরা আমাদের সমাজে অন্ধকার দূর করতে এসে, কেন তারা অন্ধকারে ডুবে যায় তা আমরা ভাবি না। কন্যা যেন উৎপাদিত পণ্য। পণ্যের বাজারে সে কলঙ্কহীনরূপে হাজির না হতে পারলে সে যেন একটা বড় দায়। কিন্তু বাস্তবচিত্রে দেখা যাচ্ছে চাঁদের কলঙ্কই তাকে আরও সুন্দর করে। তাই তো আলোর গর্ভজাতকন্যা মানসিক রোগের ডাক্তার হতে চায়। লেখিকা জানিয়েছেন, জ্যোৎস্নার মতো মানসিকতার মানুষেরা সমাজে আরও সক্রিয় হলে সাময়িকভাবে দুর্বল মেয়েরা আর ছেঁড়া নোটের মতো গণ্য হবে না।

পল্টু ভট্টাচার্য হাওড়া

হারিয়ে যাওয়ার নেশা

১ জুন রোববার-এর 'ভালো-বাসার বারান্দা'-তে নবনীতাদির কলমে মধ্যবিত্ত ঘরের আলোর জীবনকথা পড়লাম। নবনীতাদি একে রূপকথা বললেন কেন, বুঝলাম না। এক আটপৌরে মেয়ের জীবনের প্রতিচ্ছবি আলো। পালিয়ে যাওয়া রোগ নয়। অনেক সুস্থসবল মানুষকেও ভ্রমণপিপাসু হতে দেখেছি। এরা ঘরের বাইরে ঘর অন্বেষণে যায় অথবা ঘরের বাঁধাধরা চৌহদ্দিক্রান্ত জীবনে যখন হাঁফিয়ে ওঠে তখন একটু বিহঙ্গের মতো মুক্ত আকাশে পাখা মেলে! অনেকে একে কু-অভ্যাস বলে চিহ্নিত করেন। আমাদের সমাজের ব্যাকবোনে এখনও গাঢ় অন্ধকার ওঠানামা করে। এমন সমাজে অন্তত মেয়েদের হারিয়ে যাওয়ার নেশা কেউই ভাল চোখে দেখে না। ভবঘুরের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। শ্রীমতী

শিরোমণি বা জ্যোৎস্নারা এদের পাশে দাঁড়াতে পারছেন কিন্তু সমাজ কেন পারছে না? ঝাঁ চকচকে সংস্কৃতির গভীরে দগদগে ঘা কবে শুকোবে, যেদিন অন্ধকার দু-হাতে সরিয়ে আলোর জীবনকথা সবার পাথেয় হবে?

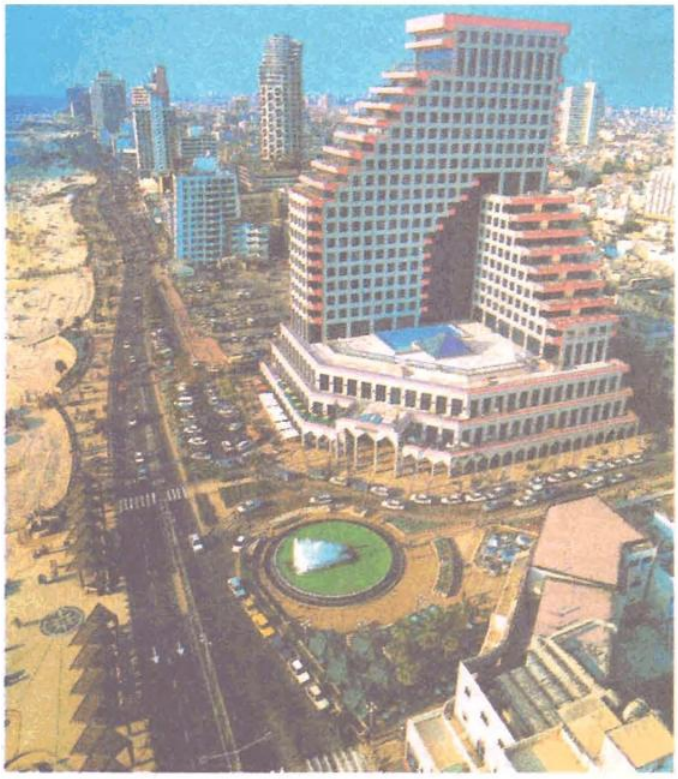

বিবেকানন্দ নস্কর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

গঙ্গার গুরুত্ব

'পথের পাঁচালি'তে জয়া মিত্রর মজে যাওয়া নদী বিষয়ে গঙ্গা নদীর পরিণাম চিন্তা করে রচিত প্রতিবেদনটি প্রশংসনীয়। দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্ম বুঝি না। ভারতবর্ষের বৃহৎ ভূভাগকে বাসযোগ্য করে ফুলের বাগান, ফলের ঝাঁপি, শস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার ভূমির তৃষ্ণা মিটিয়ে যে গঙ্গা নদী বহমান—তার গুরুত্ব, তার মূল্য সম্যক অনুধাবন করি না। তাই গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করি আবর্জনা, মলমূত্র, কলুষ, কালি প্রতিনিয়ত। অবশ্য আমাদের ভক্তিতে খাদ নেই। আমরা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে 'পতিতোদ্ধারিণী' বলে স্তোত্র আওড়াই। আমরা 'মা' বলে ডাকি। আবার এই 'মা'-কেই লাঞ্ছনা করি। এমন নির্জলা ভণ্ডামি আর কী হতে পারে?

উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল বীরভূম

অবহেলিত নদী

গভীর কথাটি গভীরতর অক্ষরে লিখে বাংলার ভয়ঙ্কর আগামবার্তা পৌঁছে দিলেন লেখিকা জয়া মিত্র 'পথের পাঁচালি'র মাধ্যমে। যা মানুষ সহজে পায়, তাকেই নষ্ট করে অবহেলায়, অনাদরে। আমরা অনেকেই নদীর মতো গর্ভধারিণীর স্নেহ মমতাকে দূরে ঠেলে দিই। যা আমাদের জীবনের ধন, তাকেই অপ্রয়োজনীয় মনে করে মরতে দিই। নিজেদের প্রাণধারাদের নিজেদের অজান্তেই রোধ করি। এই অবহেলা কেন—এমনই গূঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাল রোববার। প্রতিদিনের আলোয় দেখলাম প্রতিদিনের বাইরেটা। উপলব্ধি করলাম, ভিতর বাহির কত আলাদা।

হীরালাল শীল কলকাতা

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা :
লেটার বক্স, রোববার
সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
robbar.pratidin@gmail.com
Fax 22127977

ফা
ফার্স্ট
পার্সন

এক

তখনও আমাদের বাড়িটা দোতলা হয়নি।

মেজনাইন ফ্লোরের পশ্চিমমুখো ঘরটায় একটা ছোট্ট লাগোয়া বারান্দা ছিল।

সকালগুলো ছিল ছায়াঢাকা, বিকেলের পর বারান্দা ঘেঁষে হেলে পড়ত বেলাশেষের কমলালেবু রোদ।

দুপুরের পর থেকেই বারান্দাটা নিকোনো, চকচকে, শান্ত। কেবল আচারের বৈয়াম আর শুকোতে দেওয়া বড়ি ঘিরে কাক চড়ুইয়ের জটলা।

আর দুপুরের ঘুমে ঝিমিয়ে পড়া ঠাকুমার থেকে থেকে হাতপাখা ঠোকা।

সকালবেলার বারান্দায় বসত ঠাকুমার রান্নাঘর।

ঠাকুমা তখনকার দিনে বিধবা—স্বপাক আহার ছাড়া খেত না।

মা অনেক বলেছিল, লাভ হয়নি। বহু চেষ্টা করেও সারাজীবন ঠাকুমাকে চটিজোড়া পরাতে পারেনি মা। শীত-গ্রীষ্ম, কাদা-মাটি—ঠাকুমা খালি পা।

একাদশীর দিনটাকে আমি এখনও মনে মনে চিনি ঠাকুমার বড় কাঁসার জামবাটিটা দিয়ে। ওতে করে খই দুধ খেত ঠাকুমা।

তা ছাড়া মাসের বাকি দিনগুলো চান করে সকাল ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে ঠাকুমার রান্না বসে যেত।

আতপ চালের ভাত ফুটত বাড়িময় এক অপূর্ব সুবাস ছড়িয়ে। তার সঙ্গে কাঁচকলা আর মুগডাল সেদ্ধর গন্ধ ম-ম করত আমাদের পশ্চিমের বারান্দা জুড়ে।

আমি এককোণে একটা ছোট্ট মোড়ায় বসে ঠাকুমার রান্না দেখতাম।

মা পইপই করে বারণ করত

—কাছে যাবে না কিন্তু।

প্রথমে ভাবতাম উনুনের ভয়ে। পরে বুঝেছি পাছে ঠাকুমাকে ছুঁয়ে দিই। মা জানত ছুঁয়ে দিলেও ঠাকুমা একগাল হেসে জড়িয়ে ধরবে আমায়, বলবে না কিচ্ছু—চুপটি করে গিয়ে আবার চান করে আসবে। মধ্যে থেকে রান্নাটা ফেলা যাবে পুরো।

ছোট্ট একটা শিলে বাটনা বাটত ঠাকুমা। আর কড়ির বৈয়ামের ভেতর থেকে পলা দিয়ে তুলে আনত গুঁড়ো করা খয়েরি দানা। অনেক কষ্টে নামটা জেনেছিলাম—সৈন্ধব লবণ। আমার মহাভারত-পাগল শিশুমন কেমন করে যেন সৈন্ধব কথাটার 'ন্ধ'টা বেছে নিয়ে সদ্যশেখা 'গন্ধর্ব' শব্দটার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। আর আমার কল্পনায়, সৈন্ধব লবণ বা চালের দিব্যগন্ধ অন্ন কেমন করে যেন দেবতার আহার মনে হত।

ঠাকুমার খাবার থালাটি ছিল কাঁসার। নিয়মিত ছাই-তেঁতুলে ঝকঝকে সোনার বরণ। মনে মনে ভাবতাম, দেবতারাই কেবল বুঝি এমন সোনার থালায় খান।

ঠাকুমার রান্নার জোগাড় দেখাটা ছিল বড় আনন্দের। মোচার খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে, তারই এক কোণে গুছিয়ে রাখত লাল আর সবুজ লঙ্কা কুচি।

এর থেকে ভাল আলপনা দেওয়া আমি আর দেখিনি।

একদিন ঠাকুমা জোগাড় করতে করতে পাশে কোথাও একটা গিয়েছে, আমি ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো মোড়াতেই বসে আছি—হঠাৎ পশ্চিমের বারান্দার দমকা বাতাসে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঠাকুমার লঙ্কা কুচি। কিছু উড়ে গেল, কিছু পড়ল মেঝেতে, কিছু এদিক-সেদিক।

নেহাত লঙ্কা ঝাল—আমার হাত দেওয়ার সম্ভাবনা কম। নইলে আমার কপালে নির্ঘাত মা'র পিট্টি লেখা ছিল।

রান্না করতে করতে গল্প বলত ঠাকুমা। মনসামঙ্গলের গল্প, কাঠুরের গল্প, রূপবান কন্যা, শঙ্খমালা রাজকুমারীর গল্প। গল্পগুলো তেমন আহামরি কিছু লাগত না তখন, ঠাকুমা যে চমৎকার গল্প বলিয়ে ছিল তাও নয়। কিন্তু সেই গল্পের মাঝখানে যখনই কোনও রান্না বা খাওয়ার ঘটনা আসত, ঠাকুমার বর্ণনায় সেই জায়গাগুলো কেমন যেন জীবন্ত হয়ে যেত।

কেমন করে বড়রানি যত্ন করে হিঞ্চে শাকের বড়া 'পাক করে' দেন রাজকুমারের জন্য, কেমন করে ফুল্লরার পান্তাভাত স্বাদু হয়ে ওঠে কাগজি লেবু আর লাল টুকটুকে লঙ্কার গুণে—এই ছিল আমার সঙ্গে অন্দর-আখ্যানের প্রথম সম্পর্ক।

আমার ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার পর ঠাকুমা বেঁচেছিল প্রায় তিরিশ বছর। আমিষের ছায়া না মাড়িয়ে।

একদিন মনে আছে, আমি তখন আরেকটু বড়, সকালবেলা বাবা বাজারে যাবে; ঠাকুমা দ্বিধার পায়ে দরজায় এসে দাঁড়াল।

—একটু চিতলমাছ আনস তো?

আমরা সবাই অবাক,

মা বাবাকে বাজারের টাকা দিচ্ছিল, খোলা হাতব্যাগ বন্ধ না করে তাকিয়ে রইল ঠাকুমার দিকে।

—কাল স্বপ্ন দেখছি, চিতলমাছ রান্ধতাছি।

দিনের অবচেতনই নাকি রাতের স্বপ্ন। সেই অবচেতনের সঙ্গে কত অবদমন মিশে থাকে আমরা জানি?

দুই

ঠাকুমা মারা গিয়েছে বছর দুয়েক হল।

আমি প্লাস টু শেষ করে সবে কলেজে। মেজনাইন ফ্লোরের পশ্চিমমুখো ঘরটা এখন আমার দখলে।

তবু ওটার নামটা, 'ঠাকুমার ঘর'ই রয়ে গিয়েছে।

সেই বারান্দায় বসে একদিন বিকেলবেলা একটা গল্পের বই পড়ছি। তখন সবে বই পড়ার পোকা আমার মাথার ভেতর সারাদিন কিলবিল।

বাংলা একটা উপন্যাস—প্রথম প্রতিশ্রুতি।

এর আগে আশাপূর্ণা দেবীর ছোটদের গল্প অনেক পড়েছি। বড়দের লেখা বোধহয় এই প্রথম।

পশ্চিমের বারান্দায় কমলালেবু রোদ। স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম সেই রোদে বসে পিঠ-ছাপানো চুল শুকোচ্ছে ছোট্ট সত্যবতী।

খুন্তি নাড়ার সত্যিটা, ভাত ফুটোনোর গন্ধ ভর করে যে হেঁসেল থেকে কোনওদিন কোনও কল্পনার অমরায় যাওয়া যায়, সেটা একদিন শিখিয়েছিল ঠাকুমা। আবার নতুন করে শিখলাম আশাপূর্ণার কাছে।

আশাপূর্ণা নামটা আমার কাছে বড় রূপকী। কত না বলা কথা, কতদিনের সঞ্চিত অন্দরমহলের কান্না ধীরে ধীরে শার্সি খুলে পাখা মেলতে শিখেছে আশাপূর্ণার কলমে।

নিভে যাওয়া সব আশা জেগে উঠছে আবার। পূর্ণতা পাচ্ছে পশ্চিম বারান্দার কমলালেবু আলোয়।

আর তারই মাঝে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এককোণে বসে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জপতে জপতে মনের আনন্দে চিতলমাছ রাঁধছে ঠাকুমা।

ভীরু স্বপ্নে নয়, সাদা থানের গ্লানিতে নয়। জীবনের নিত্য উৎসবের আয়োজনে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ

অল্পবয়েসে আশাপূর্ণা দেবী

নবনীতা দেবসেন

আশা পিসিমা এবং আমরা সবাই

কুড়ি বছর আগে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আশাপূর্ণা দেবীর বিষয়ে লিখেছিলেন—'ওঁর কোনও লেখাই পড়ে কখনও মনে হয়নি, এ লেখাটা না পড়লেও চলত।' এই ছোট্ট মন্তব্যটুকু যে কত গভীর বার্তা বহন করে আনে একজন লেখকের সম্পর্কে, তা যিনিই লেখালিখির চেষ্টা করেন তিনিই বুঝবেন। কথাটি প্রগাঢ় অর্থপূর্ণ—আসলে শীর্ষেন্দু বলছেন, আশাপূর্ণার প্রতিটি লেখাই জরুরি। একজন তরুণ লেখকের কাছ থেকে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য আসা অত্যন্ত মূল্যবান। সেই যুগটা নারীর কলমকে সম্মান করতে ঠিক শেখেনি তখনও—আশাপূর্ণাকে নেহাত 'হাঁড়ি হেঁশেলের লেখিকা' বলে অসম্মান করারও একটা খোলাখুলি প্রবৃত্তি ছিল তৎকালীন অত্যাধুনিক যুবক লেখকদের মধ্যে। কিন্তু তারই মধ্যে আশাপূর্ণা তাঁর আশি বছরের জন্মদিনে এমন একটি মূল্যবান মন্তব্য আদায় করে নিয়েছেন শীর্ষেন্দুর কলমে। শীর্ষেন্দু আরও লিখেছিলেন, মূল্যবোধে পুরনো পন্থী হয়েও আধুনিক যুগ সমস্যা ও তার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে আশাপূর্ণা অতি আশ্চর্যরকমের ওয়াকিবহাল তাঁর লেখাতে। শীর্ষেন্দুর কথাগুলি বলছি কেননা এগুলি আমারও কথা, কিন্তু আমারই একার কথা নয়। সেটাই জানানো জরুরি। শীর্ষেন্দু সানন্দে স্বীকার করেছেন 'আশাপূর্ণার লেখার একটা বড় পরিপ্রেক্ষিত আছে, একটা বড় পটভূমি আছে'—নারী, পুরুষ, সমাজ সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই সমস্যার বিচার করেন তিনি। 'সমাজে নারীর স্থান মোটামুটি কী হবে সে বিষয়ে তাঁর ধারণা স্পষ্ট। সেইজন্যই আমাদের আমলে লেখিকা হিসেবে আশাদির প্রাসঙ্গিকতা আছে।' অবিকল শীর্ষেন্দুর স্বরে কথা বলেছেন বুদ্ধদেব গুহ—(যাঁর স্বরটি মোটেই শীর্ষেন্দুর মতো নয়) তিনিও লিখেছেন 'গত চল্লিশ বছরে তাঁর যত লেখা পড়েছি—তার মধ্যে একটিকেও 'খারাপ' বলতে পারি না। পৃথিবীর যে কোনও লেখক-লেখিকার পক্ষেই এই মানের উচ্চতায়, বা সমতায় পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।' হ্যাঁ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন আশাপূর্ণা। তাঁর একটিও অসার্থক রচনা নেই যদিও তিনি লিখেছেন প্রভূত পরিমাণে, অবিরল ধারায়।

আমাদের সমসাময়িক লেখকদের কিছু কথা তুলে দিচ্ছি, পরবর্তী প্রজন্মের প্রণাম ও সম্ভ্রম এতে প্রকাশিত বলে। এবং এই সব কথাগুলিই নবনীতাও বলতে চায়। তার বদলে বলছেন শীর্ষেন্দু, সুনীল, বুদ্ধদেব গুহ, প্রফুল্ল রায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়—এইসব পুরুষ গদ্যকারেরা। গার্হস্থ অবরোধের মধ্যে বেঁচেও বৃহৎ বিশ্ব ও বিচিত্র মানবচরিত্র সম্পর্কে আশাপূর্ণার ধারণা দেখে বিস্ময়ে শীর্ষেন্দুর মনে হয়েছে 'এ এক অলৌকিক ব্যাপার'—কেননা 'শুধু কল্পনা দিয়েই তো এ জিনিস লেখা সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর সাহিত্যিক হওয়াটা যে-কোনও মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ কঠিন ছিল, এই অত্যন্ত সংবেদনশীল, প্রায় ফেমিনিস্ট মন্তব্যটি আমারও খুব মনের মতো। আমরা তো খোলা জগতে ঘুরে বেড়াই। চোখ খোলা, কিন্তু মন বন্ধ। কিছুই দেখতে পাইনে। আমার পিসিমার 'এক্সরে আইজ' ছিল পি.সি সরকার সিনিয়রের মতো। চোখে ফেট্টি বেঁধেও জীবনের সব লিখনগুলি পড়তে পারতেন পিসিমা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'শুধু বাংলা ভাষায় নয় সারা ভারতের একজন প্রধান লেখিকা। আশাপূর্ণার এই অসামান্য কীর্তির পিছনে রয়েছে অবশ্যই তাঁর মনের জোর।' তারপর সুনীল লিখেছিলেন, 'আজকালকার

মেয়েদের উচিত বিশেষ করে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করা।' কীভাবে সব বাধাবিপত্তি উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, সেই শিক্ষার প্রেরণা।

আমি তো মনে করি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই গ্রহণযোগ্য। সুনীল আশাপূর্ণার মধ্যে 'বিশ্বমানবতার পরিচয়' পেয়েছেন—যে মহিলা ঘরের বাইরে বেশি বেরোননি তাঁর কলমে বিশ্বমানবের মুখ দেখতে পাওয়া খুব বড় কথা।

মহাশ্বেতাদেবীও ঠিক এইভাবেই বলেছিলেন আশাপূর্ণা শুধু ভারতেরই প্রধান লেখিকা নন, সম্ভবত সারা পৃথিবীরই প্রধান লেখিকাদের অন্যতম। এই ব্যাপারটাই বুদ্ধদেব গুহের ভাষায় পড়লে, 'সারা বিশ্ব তাঁর ঘরে এসে বাসা বাঁধে। সারা বিশ্বের অনুভূতি!' প্রতিযোগী ছোটদের কাছে এমন শংসাপত্র ক'জন লেখিকার ভাগ্যে জোটে?

এই মন্তব্যগুলি কুড়ি বছর আগের। আশাপূর্ণার আশি বছরের জন্মদিনে আমিও লিখেছিলুম—'আমাদের যুগে যাঁরা গদ্য লিখছেন (পঞ্চাশের লেখকও আছেন) তাঁদের মধ্যে আজও পর্যন্ত আশাপূর্ণা দেবীর মতো জরুরি লেখক কেউ আছেন বলে আমি মনে করি না।' আশাপূর্ণার সামগ্রিক কথাসাহিত্য গবেষকদের কাছে এক স্বর্ণখনি। মানবীবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সামাজিক ও নাগরিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস—যেদিক থেকেই তুমি দেখবে, আশাপূর্ণার নতুন কিছু দেওয়ার আছে। অসীম ধন তো আছে তোমার।

মনে করা যাক প্রফুল্ল রায়ের সেই ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার্ঘ্য—'ক্ষমতা থাকলে আশাপূর্ণা দেবীকে নোবেল প্রাইজ দিতাম।' হ্যাঁ, আমিও দিতাম, প্রফুল্লবাবু! নিঃসন্দেহে আপনার সঙ্গে আমি একমত। একমত মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গেও। মৈত্রেয়ী দেবী একবার লিখেছিলেন—আশাপূর্ণা প্রত্যেকটি মেয়ের কৃতজ্ঞতার পাত্রী—তিনি যেমনভাবে মেয়েদের কথা লিখেছেন সেভাবে আর কেউই লেখেননি। আশাপূর্ণা দেবীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধার প্রশংসা সকলেই করেছেন। যিনি কোনও নিয়মমাফিক শিক্ষা পাননি—দাদাদের দেখে দেখে উল্টোদিক থেকে অক্ষর পরিচয় হয়েছিল যাঁর—তিনি কেমন করে এত মহান একজন কথাশিল্পী হয়ে উঠলেন? শুধু মেধার ম্যাজিকে। আর অমানুষিক পরিশ্রমে। সংসার ও শিল্পের দ্বৈত দাবী তিনি নিশ্ছিদ্রভাবে পূরণ করেছেন। না তাঁর সাংসারিক কর্তব্যে ত্রুটি দেখাতে পারবেন কেউ—না তাঁর সাহিত্যিক কারুকর্মে ত্রুটি ধরতে পারবেন কেউ। প্রবল নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, আর ত্রুটিহীন কাজ ছিল তাঁর চরিত্রগত অভ্যাস।

আশাপূর্ণা দেবী শেষ জীবনে বাইরের জগতে যথেষ্ট বেরিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রথম পঞ্চাশ বছর কেটেছিল প্রধানত ঘরেই। কিন্তু তাঁর মন ছিল না চার দেওয়ালে বন্দি। তিনি লিখতেন সমাজ সংসারের ভিতরের কথা। মানুষের সম্পর্কের জটগুলোর কথা। গল্পের জন্য দরকারি বহিরঙ্গের কিছু ঘটনা থাকে, কিন্তু তাঁর আসল গল্পটায় থাকে অন্তর্জগতের খেলা। মনের ভিতরের নড়াচড়া আসল কাহিনিটা কিন্তু ঘটনার চক্রের নয়। সেই কারণেই তিনি মহৎ লেখিকা। সেই কারণেই তাঁর লেখা একবার পড়ে ফুরিয়ে যায় না, বারবার পড়া যায়। কেননা আসল গল্পটা মনের মধ্যে ঘটে। অত্যন্ত চালাকি করে তিনি চট করে সে ব্যাপারটা বুঝতেও দেন না, চিরাচরিত ফর্মে গল্প উপন্যাস লিখে যান। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় একবার আশাপূর্ণার কৌতুক রস, মৃদু রঙ্গরসিকতার কথা, ও শিশু সাহিত্যের অসামান্যতার কথা লিখেছিলেন। সেটাও আজ মনে করিয়ে দিই। লীলা মজুমদার আর আশাপূর্ণার কৌতুকরস তাঁদের গদ্যকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। কৌতুক কিন্তু সহজলভ্য নয়! সুসমঞ্জস্য সুরুচিসম্মত কৌতুকরস বড় দুর্লভ বর্তমান বাংলা সাহিত্যে। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই গভীর কথা গম্ভীর স্বরে বলা পছন্দ করেন। আশাপূর্ণার হাতে শ্লেষ বিদ্রূপের শান দেওয়া ধারাল কলমও ছিল, শুধু কৌতুকই নয়। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আশাপূর্ণার শিশুসাহিত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন শিশুর মন চিনতে হলে, লেখকের আধ্যাত্মিক চেতনা থাকা প্রয়োজন। আমি তো বলব মানুষের অন্তরাত্মাকে না চিনলে কি সৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব?

আশাপূর্ণা তাঁর সন্তানের বয়সী অনুজ লেখকদের কাছে যে শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়ে গিয়েছেন তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাঁর লেখনীর। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন—'আশাপূর্ণা কোনও বড় কাগজের মদতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি'—একথা একান্ত সত্য! মহাশ্বেতা তাঁর অননুকরণীয় কণ্ঠে বলেছেন 'বাংলা সাহিত্যে তার স্থান সম্রাজ্ঞীর মতো। ভারতীয় সাহিত্যেও তিনি অতুলনা।

পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসেও তাঁর মতো এরকম অবিরাম লিখে চলার দৃষ্টান্ত কতগুলি আছে জানি না।'—তারপরে মহাশ্বেতার উদারতা আরও ছড়িয়ে পড়ে—'আমি জানি, আমাদের বহুজন যখন পাঠকের কাছে থাকব না আশাপূর্ণা দেবী তখনও থেকে যাবেন। সম্রাজ্ঞীর আসনেই থাকবেন।' মহাশ্বেতাদি নিজেই এক সম্রাজ্ঞীর আসন থেকে আরেক সম্রাজ্ঞীকে বিনত সেলাম জানাচ্ছেন, এ এক অপূর্ব মুহূর্ত আমাদের কাছে। এতে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু রয়েছে। এঁদের বিনয়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জোরটাই সবচেয়ে স্পষ্ট, বিশেষত লীলা মাসিমা আর মহাশ্বেতাদি যেভাবে আশাপূর্ণাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আশাপূর্ণার সমগ্র রচনাকে মহাশ্বেতা 'দশক থেকে দশকে বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতা ও সম্পর্কের বিবর্তনের সমাজদলিল বলে দাবি করেছেন। বাংলাভাষার লেখকরা অনেকেই অনেকদিন ধরেই এভাবে চিন্তা করেছেন—শ্রদ্ধা করেছেন। অপার মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। আশাপূর্ণার অসামান্য বিনয়ী স্বভাব তাঁর নিরহঙ্কার আচরণ দাম্ভিক পণ্ডিতদের তাঁকে ঠিকমতোন চিনতে দেয়নি বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। যথাযথ সমালোচনা হয়নি তাঁর যথাসময়ে। যদিও পাঠকদের চিত্তের ভালবাসা ও শেষ বয়সে সে যাবতীয় পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। তাঁর জুটেছিল প্রকাশকদের কৃতজ্ঞতাও—বেশির ভাগ লেখকের কপালে যেটি বিরল। তা ছাড়া আশাপূর্ণার ঘরের মধ্যে প্রবল সাপোর্ট সিস্টেম ছিল। তাঁর দাদা যোগাতেন বোনের লেখার সমস্ত কাগজ, লাইনটানা প্যাড তৈরি করে আনতেন আশাপূর্ণার জন্য। আর স্বামী গুছিয়ে রাখতেন যাবতীয় কাগজপত্র, ফাইল, প্রাপ্য টাকাকড়ি, এমনকী প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি সংস্করণের প্রথম কপি জমিয়ে রাখতেন তিনি। পিসেমশাইয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর কাজগুলি তুলে নিলেন সুশান্তদা—মায়ের বইপত্রের সমস্ত কিছু তিনি দেখতেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নূপুর—আশাপূর্ণার হাতে গড়া পুত্রবধূ। এখন আশাপূর্ণার শতবর্ষ উদযাপনে নূপুরের ভূমিকাই প্রধান। আশাপূর্ণা যেমন সংসারের গিন্নির প্রতিটি ছোট বড় দায়দায়িত্ব নিজেই বহন করতে ভালবাসতেন—সব কাজ সেরে, তবে তিনি বসতেন কাগজ কলম নিয়ে। তাঁর সংসারের মানুষগুলিরও তাঁর প্রতি ততই সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তাঁরাও আপ্রাণ চেষ্টা করতেন তাঁকে সাহায্য করতে।

আমার সৌভাগ্য, আমি আশৈশব তাঁর কাছে কন্যাস্নেহ পেয়েছি। আশাপূর্ণা পিসিমা আমার মা-বাবাকে তাঁর দাদা-বউদি বলেই মনে করতেন। আমার পিসিমার ভূমিকা তিনি যতদিন সুস্থ ছিলেন সানন্দে পালন করেছেন। অজস্র আদর পেয়েছি তাঁর কাছে। আমি যখন পড়তে আমেরিকা চলে যাচ্ছি তখন পিসিমা কৃষ্ণনগর থেকে ছোট্ট মা দুর্গার মূর্তি এনে দিয়েছিলেন। 'পুজোর সময় তুই দুর্গার মুখ দেখতে পাবি না, একে সঙ্গে নিয়ে যা।' কিন্তু আমি নিয়ে যাইনি ভেঙে যাওয়ার ভয়ে। ভাগ্যিস নিয়ে যাইনি। মূর্তিটি এখনও ভাল-বাসা বাড়িতে কাচের বাক্সের মধ্যে বসে আছে। দেশ পত্রিকাতে আমার প্রথম প্রকাশিত গল্পটি পড়ে আশা পিসিমার এত ভাল লেগেছিল যে তিনি একটি মোটা, সবুজ রঙের মলাটের বাঁধানো খাতা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন তাতে লিখেছিলেন—'প্রথম উপন্যাসের জন্য, নবনীতাকে আশা পিসিমা।' কিন্তু আমার প্রথম উপন্যাস আমি সেই খাতাতে লিখিনি। খাতাটি এখনও লোহার আলমারিতে তোলা রয়েছে। প্রত্যেক পুজোয় আশা পিসিমার দেওয়া শাড়িটি সপ্তমীতে পরতুম—মায়েরটা ষষ্ঠীতে। শাশুড়ি মায়েরটা অষ্টমীতে, আর মামাবাড়িরটা নবমীতে, মামণিরটা দশমীর দিনে। এখন সেসব বাড়িতে সেসব মানুষরা কেউই নেই। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত ফাঁকা। যেমন পুজোবার্ষিকী খুললেই প্রথমে পিসিমার লেখাটি পড়তুম। এখন সূচিপত্রটা ফাঁকা।

তাঁর ট্রিলজি বিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই—সে অসাধারণ কাজ সকলেরই বিস্ময়। আশাপূর্ণা পিসিমার মধ্যে দু'জন মানুষ ছিলেন একজন বিশ্বসংসারের পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেইলের নজরওলা গিন্নি আর একজন অন্তরে বাহিরে সুদূর প্রসারী দৃষ্টিসম্পন্ন জটিল শিল্পী। 'পৌরুষ' বলতে আমরা যেসব গুণগুলি বোঝাতুম এতকাল (এখন বলি না) সেগুলির অসামান্য পরিচয় আছে আশাপূর্ণার কলমে ('কোথা সে রমণী বীর্যবতী!') অত্যন্ত দুঃসাহসী বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি লিখেছেন সেই চল্লিশের দশকে—মধ্যবয়সী নারী পুরুষের অস্ফুট ভালবাসা নিয়ে তাঁর একাধিক রচনা আছে। সংসারী বয়স্কা নারীর জীবনে পুত্রকন্যা ঠাকুরঘর রান্নাঘর ছাড়িয়েও যে একটা ফাঁকা জায়গা থাকা সম্ভব, প্রেমে যে শুধুই যৌবনেরই দাবি নেই, সে কথা আশাপূর্ণা লিখেছিলেন সবার আগে। নারীর কলমে এই সত্য উচ্চারণে তখন দুঃসাহস লাগত। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং যত্নশীলা কথাশিল্পী বলে আশাপূর্ণা তাঁর যা বলার তা সবটুকুই বলেছেন, অথচ রক্ষণশীল পাঠকেরও বিরক্তি উৎপাদন করেননি। বিস্ময় ও মুগ্ধতাই সৃষ্টি করেছেন। বয়স্কা হৃদয়েও যে সহমর্মিতার, সাহচর্যের, মুখোমুখি বসিবার, একটি মানুষ লাগতে পারে, সেটি আশাপূর্ণা লিখেছেন একাধিক কাহিনিতে। সংসার, সন্তান যে তাতে বাধা দেয়, সেই 'নামহীন' সম্পর্কও যে স্থায়ী হওয়া সম্ভব হয় না, কেননা তার কোনও সামাজিক সংজ্ঞা নেই—'গিন্নিমায়ের বন্ধু'—হত না তখন। এখনকার মন দিয়ে বোঝা কঠিন, কত দুঃসাহসী সেইসব লেখা। ছোট মেয়ের চোখ দিয়েও তিনি দেখিয়েছেন বারবার বড়দের মিথ্যা, বড়দের প্রতারণা, বড়দের নির্বুদ্ধিতা কীভাবে ছোটরা বুঝতে পারে। আশাপূর্ণার লেখাতে অসাধারণ নির্মমতা আছে—মেয়ে মানুষের মধ্যেকার শক্তি সাহস এবং অপার নিষ্ঠুরতা সবই তিনি তুলে ধরেছেন। পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের তৃপ্তি, আহ্লাদী পুত্রবধূ এবার তাঁর নিরিমিষ্যি হেঁশেলে ভর্তি হল—বুঝুক বৈধব্য কাকে বলে! এরকম অজস্র লেখা মনে পড়ছে। এক মেয়ে বিচারকের ঘর ও বাইরের দ্বন্দ্ব নিয়ে অসামান্য এক উপন্যাস পড়েছিলুম। পিসিমা ছিনতাইবাজ পকেটমার মাস্তানদের নিয়েও লিখেছিলেন একবার। আশাপূর্ণার এই দিকটি নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীও মুগ্ধ মন্তব্য করেছিলেন। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সব গলিঘুঁজিগুলো তাঁর চেনা ছিল যেসব পথে আমরা এখনও পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

১৮.১০.০৮

simoco
MOBILES
www.simoco.net
Dual SIM
Music Masti
Music Masti
Music Masti
SM 1101
Dual SIM / Dual Standby
Camera / FM Radio
Bluetooth / Mp3 / Mp4
Polyphonic / Mp3 Ring Tone
Rs.4499
SM 299
Pitch shift / FM Radio
Music & Movie Player
Audio & Video Recording
Camera / Colour Display
Rs.2999
SM 233
FM Radio / Mp3 Music Player
Polyphonic / Mp3 Ring Tone
Dual SIM / Single Standby
LED Torch / Colour Display
Rs.2499
SM 633
FM Radio / Mp3 / Mp4
Polyphonic / Mp3 Ring Tone
Dual SIM / Single Standby
Bluetooth / Camera
Rs.5599
Chota Ustad
SM 399
Dual SIM / Single Standby
Bluetooth / LED Torch Light
FM Radio / Mp3 / Mp4
Camera / Colour Display
Rs.3899
Rango Ka Fashion
SM 288
5 COLOUR Back Covers
FM Radio / Music & Movie Player
Polyphonic / Mp3 Ring Tone
Camera / Colour Display
Rs.3399
Chota Ustad
SM 388
Bluetooth / FM Radio / Mp3 / Mp4
Polyphonic / Mp3 Ring Tone
Black List Function
Camera / Colour Display
Rs.3799
Desh ki dhadkan ko sun

এ
এবার মলাট

অন্তরমহল

রান্নাঘরের লেখিকা, মেয়েলি লেখা, মেয়েমহলের আরশি—এই যেন আশাপূর্ণা। অথচ খতিয়ে দেখলে এসব তিলকই তাঁর সৃষ্টির প্রকৃত অভিজ্ঞান, অহঙ্কার। তিনি মেয়েদের কথা লিখেছেন একজন মেয়ের চোখ থেকে, মেয়ের মন থেকে, পুরুষতন্ত্রের উল্টো স্রোতে দাঁড়িয়ে। বাংলা ভাষায় নারীচেতনাবাদের পূর্বমাতৃকা তিনিই।

জয়া মিত্র

আশাপূর্ণা দেবীর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৮৯। হ্যাঁ, একশো উননব্বই। যদি সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত, শ্রীমতী মানসী দাশগুপ্তার সযত্নলিখিত বইটিকে বিশ্বাস করতে হয়। একমাত্র মহাশ্বেতা দেবী ছাড়া আর কোনও বিশ্বমানের ঔপন্যাসিকের রচনা গুনতিতে এর কাছাকাছি আসতে পারবে না বলেই মনে হয়।

কী হতে পারে এই বিপুল সংখ্যক লেখার কারণ, মানে প্রধান কারণ অবশ্যই লেখকের প্রবল জনপ্রিয়তা। বাংলায় 'পুজো সংখ্যা' নামে যে বিশেষ সাহিত্য প্রকাশনার উৎসব প্রচলিত, তার সংগঠক পত্রিকা সম্পাদকরা নিশ্চিত থাকতেন যে ওই লেখকনামের সঙ্গে 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' শব্দবন্ধটি যুক্ত থাকলে পত্রিকার বিক্রি বাড়বেই। বিশেষত বাঙালি পাঠককুলের এক বিরাট অংশ যখন মেয়েরা। মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা কী গৃহিণীরা। আশাপূর্ণার লেখায় যাঁরা নিজেদের খুঁজে পেতেন। হয়তো সর্বদা খুব সত্যি নয় সেই খুঁজে পাওয়া, তবু পারিপার্শ্বিকের মিল তো এক গভীরতর মিলের বিভ্রম তৈরি করে।

আর হয়তো এই আপাত পারিপার্শ্বিক, যা ছিল আশাপূর্ণা দেবীর জনপ্রিয়তার চাবি, তাই-ই হয়ে উঠেছিল এই ভাষার উচ্চ বুদ্ধিজীবী লেখক সমালোচকমণ্ডলীতে তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ। নাম উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকাই শোভন। কেননা আশাপূর্ণার বুদ্ধিজীবী বিচারকরা অনেকেই এখনও কর্মশীল, কিন্তু 'রান্নাঘরের লেখিকা' 'মেয়েলি লেখা' এসব তিলক আশাপূর্ণার গল্প উপন্যাসের গায়ে শুধুই সেঁটে দেওয়া নয়, তাঁর লেখা-বিষয়ক আলোচনাকেও ওই এক শীলমোহর লাগিয়ে একবারেই ব্রাত্য করা হয়।

বাংলা উপন্যাসের প্রধান আলোচকরা বহু ভাষাপ্রধান, বিষয় বা সময়চিহ্নবিহীন উপন্যাসের পুরুষ লেখকদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন অথচ আশাপূর্ণা সেখানে ঔপন্যাসিক হিসেবে আলোচিত হননি। হয়তো 'অলসো র‍্যান' হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন মাত্র।

এমনকী 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে উপন্যাস প্রবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তাকেও 'একটি অসাধারণ ভারতীয় উপন্যাসের আবির্ভাব' হিসেবে বৃত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, বারো বছর। 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারে সম্মানিত হওয়া পর্যন্ত। বছরের পর বছর জনপ্রিয়তার শিখরে থেকেছে আশাপূর্ণার বই অথচ সেইসব রচনা নিয়ে কোন সিরিয়াস আলোচনা হয়নি বললেই হয়। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে অনেকবার কথাসাহিত্য শাখার সভানেত্রী, সাহিত্য শাখার প্রধান নির্বাচিত হওয়ার সম্মান পেয়েছেন আশাপূর্ণা, জীবিতকালেই অন্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর পঞ্চান্নটি বই অথচ সাহিত্য আকাদেমির বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের পুরস্কার প্রাপক নন তিনি। সাধারণভাবে একে ব্যাখ্যা করা যায় 'মহিলা সাহিত্যিক'দের প্রতি 'সাহিত্যবোদ্ধা'দের উদাসীনতা দিয়ে, যে-উদাসীনতা এত ব্যাপক যে প্রায় 'স্ব-ভাব' বলেই প্রতিভাত হয় কখনও কখনও। যে উদাসীনতার নির্মল অজ্ঞানতায় কোনও সাহিত্যসভায় নবনীতা দেবসেনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় কবিতা সিংহ বলে এবং স্বভাবকৌতুকে নবনীতা যখন বলেন 'আজ্ঞে না, আমি মহাশ্বেতা দেবী' তখনও উদ্যোক্তাদের কোনও বৈকল্য ঘটে না। আজ থেকে পনেরো বছর আগে দুই ছাত্রী যখন তন্নতন্ন করে খুঁজছিলেন বাংলায় দেশভাগ নিয়ে লেখা উপন্যাস, তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, কথা বলেছিলেন অন্তত দশজন ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য অধ্যাপকের সঙ্গে। কেউ বলেননি জ্যোতির্ময়ী দেবী নামে এক আশ্চর্য লেখিকার নাম কিংবা 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের কথা। বলেননি সাবিত্রী রায়ের 'বদ্বীপ' কী 'স্বরলিপি' নামে মহাকাব্যোপম রচনার নাম। এসব নাম সেই ছাত্রীদের নিজেদের ধীরে ধীরে খুঁজে বার করতে হয়েছিল। কিন্তু শুধু এই 'মহিলা সাহিত্যিক' বাচক উদাসীন বিস্মৃতির চেয়েও কঠিন দেওয়াল হয়তো ঘিরে ছিল আশাপূর্ণা দেবীর লেখাকে।

জ্যোতির্ময়ী দেবী কী সাবিত্রী রায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ছিলেন পাঠক সাধারণের আয়ত্তের আড়ালে, যদিও কালের বিচারে সাবিত্রী রায় আশাপূর্ণার প্রায় সমবয়সিনী। কিন্তু আশাপূর্ণা তো প্রকাশনায় ও পাঠকচিত্তে প্রবলভাবেই উপস্থিত। তা হলে, অনুমান করা যায় অন্য কোথাও নিহিত আছে আশাপূর্ণা সম্পর্কে এই 'উদাসীন বিস্মৃতি'র কারণ। তা কি এই যে, আশাপূর্ণা সত্যি সত্যিই 'রান্নাঘরের লেখিকা'? রান্নাঘরকে দেখছেন রান্নাঘরের ভিতরকারই দৃষ্টি দিয়ে, এমনকী বাইরের পৃথিবীকেও দেখছেন সেই একই জায়গা থেকে। এই 'অন্য দৃষ্টি'টি এর কিছু আগে পর্যন্ত বাংলায়, শুধু বাংলায় বা কেন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই মূলধারার সাহিত্যে কিছুটা অনুপস্থিত আর অনেকটা অনালোকিত ছিল। কালো আমেরিকান মেয়ে অ্যালিস ওয়াকার বিশ্ববিদ্যালয়ে

আমেরিকান সাহিত্য পড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করেন সেখানে কালো মানুষদের লেখার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। কোনও কালো লেখকের লেখা নেই পাঠ্যতালিকায়, নেই কালো মানুষদের জীবনঘটনা, তাদের সমাজ, সংস্কৃতি নিয়ে তাদের নিজেদের কোনও লেখা। যা আছে সাদা মানুষদের চোখ থেকে দেখা কালো মানুষদের উল্লেখ। আর তাই পঠিত হচ্ছে 'আমেরিকান সাহিত্য' বলে। অর্থাৎ সাদা মানুষ যারা একসময়ে এসেছিল 'লাল মানুষদের' দেশে, অস্ত্র আর বিশ্বাসহননের জোরে ধ্বংস করেছিল তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, যে সাদা মানুষরা পরবর্তীকালে সংগঠিত অস্ত্র শক্তিতে দলে দলে কালো মানুষকে ধরে এনেছিল আফ্রিকা থেকে, লাগিয়েছিল তাদের উৎপাদনের হাড়ভাঙা খাটনি করা ক্রীতদাসত্বের কাজে—পরবর্তীকালে সেইসব মানুষের রচিত সাহিত্য, তাদের সমাজ-সংস্কৃতির চিহ্ন, তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বের সমস্ত যন্ত্রণাকেই মুছে দেওয়া হল সমাজের ইতিহাসের মধ্যে থেকে। ক্ষমতা যাদের হাতে ছিল তাদের সংস্কৃতিই স্বীকৃত হল সংস্কৃতির, সংস্কৃতি-ধারণার 'মূলধারা' বলে।

ক্ষমতার নিজস্ব যে সব প্রয়োজনীয় ধারণা তাকেই ক্ষমতা জোরের সঙ্গে প্রচার করে সর্বজনীন বলে। প্রচার করে বীরত্বের সবলতার শৌর্যের প্রভুভক্তির সততার নিজস্ব ধারণা আর সমাজের সমস্ত স্তরকে বোঝাবার চেষ্টা করে ওইটেই 'আদর্শ' এবং 'মনুষ্যজীবনে অবশ্য আচরণীয়'। যুদ্ধে নরসংহারকারী সেনাপতির বীরত্ব, ক্রীতদাসের প্রভুভক্তি, বাবার (বা নেতা কিংবা রাজা বা সংসারের প্রধান পুরুষ) আদেশ মান্য করে বালক ক্যাসাবিয়াঙ্কার বিচার-বিবেচনাহীন মৃত্যুবরণ, অন্যপুরুষের স্পর্শ অপেক্ষা মেয়ে (শরীর)দের মৃত্যুও ভাল—এরকম আরও বহু ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার অনুকূল মূল্যবোধ প্রচারিত হয়ে আসে।

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পুরুষতান্ত্রিকতা বা ক্ষমতাকেন্দ্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে যে অস্মিতা বা আইডেনটিটি'র অধিকার-আন্দোলন শুরু হল, সেই আন্দোলন সাহিত্যবিচার ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে। ষাটের দশকে মার্কিন সাহিত্যের পাঠ্যতালিকায় কালো মানুষদের অস্তিত্বের চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে অ্যালিস ওয়াকার খুঁজে বার করছেন তাঁর থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার লেখিকা, কালো লেখিকা, জোরা নিয়েল হার্টসনকে। কালো মানুষদের গান, তাদের নিজস্ব গল্প, তাদের বিশ্বাস, তাদের জাদুমন্ত্র, নানা সংস্কার—যা কিছু পেরেছেন লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলেন এই মানুষটি—জোরা নিয়েল হার্টসন। আত্মান্বেষণের মূলধারার মধ্যকার কিংবা মূলধারা থেকে ভিন্ন নিজস্ব পরিবারের উৎস থেকে উঠে এল অ্যালিসের দর্শন—মানবী চেতনাবাদ, উত্তম্যানিজম্। লেখা হল 'ইন সার্চ অব আওয়ার মাদার্স গার্ডেনস'। মেয়ের চোখ দিয়ে মেয়ের মন থেকে, ক্ষমতাকেন্দ্রের বিপরীত বিন্দু থেকে দেখা সমাজের ইতিবৃত্ত।

এই 'অন্য'কে খোঁজা, তথাকথিত মূলধারার থেকে ভিন্নতায় আত্ম-অনুসন্ধান—এইখান থেকে আমরাও আজ আশাপূর্ণাকে দেখি। তাঁর লেখাকে নতুন করে পড়ি আর অবহেলায় দেওয়া সেই তকমা 'মেয়েলি লেখা', তাই তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।

তার আগে পর্যন্ত সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সমগ্রই পুরুষতান্ত্রিক। রাসসুন্দরী দেবী কী বিনোদিনী পর্যন্ত, নিজেদের 'মেয়েলি' ধরন নিয়েও নিজেদের দেখছেন পুরুষের গড়ে দেওয়া সমাজের চোখ দিয়েই। তাই রাসসুন্দরী পরপর তিনবেলা উপোসী থেকেও 'নিজের কপাল' মেনে নিচ্ছেন, মৃত্যুশয্যা ছাড়া আর মা'কে দেখতে যেতে না পারাকেও মেনে নিচ্ছেন সেই একই বশ্যতায়। বাঙলা পেশাদারি নাটকের জন্য সর্বস্ব দেওয়া ও প্রবঞ্চিত বিনোদিনী তাই কাতরভাবে নিজেকে উল্লেখ করছেন 'পাপীয়সী' বলে। তা ছাড়াও, তারপরও, মহিলা সাহিত্যিকেরা কাহিনি বুনছেন সেই পুরুষতান্ত্রিক ধাঁচেই। সেসব রচনায় কিছু অনুপুঙ্খ ছাড়া মেয়েদের নিজস্ব ভুবনের, নিজস্ব পরিচয়ের চিহ্ন অনেক কম। একথা সর্বদা মান্য যে এঁরাই পূর্বমাতৃকা, এঁরা সযত্নে বেঁধেছিলেন বলে, অনুরূপা-নিরুপমা-শৈলবালা-প্রভাবতী একটি ধারার অস্পষ্ট পরিচয় নির্মাণ করছিলেন বলেই, বাংলা সাহিত্যের মানসজমিনে একসময়ে আশাপূর্ণা-মহাশ্বেতা-নবনীতার ফসল ফলল।

যে মেয়েরা সমাজের অর্ধাংশ, যাঁরা গৃহিণী (স্ত্রী, মা, বোন, কন্যা যে কোনও পরিচয়ে) হয়ে গৃহের সমার্থক একটি জনগোষ্ঠীর রান্না-খাওয়া-পোশাক-গৃহসজ্জা-উৎসব-আচরণ-সংস্কারসমন্বিত আন্তরসংস্কৃতি রক্ষা ও বহন করেন, **সেই** মেয়েদের নিজস্ব জীবনযাপনের চিহ্ন, তাদের ভাবনার ধরন, এ যদি সাহিত্যে কোথাও স্বীকৃত না হয় তা হলে সেই সমাজের সামাজিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যায়! ১৯০৯ সালে জন্ম নেওয়া, দেশের তৎকালীন প্রধান শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা মেয়েটি কঠিনভাবে হলেও, বিদ্যার্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশ শতকের শুরুর দিকের সামাজিক রীতিনীতি, ১৯৩২ এর স্বদেশি আন্দোলন, যুদ্ধের ধাক্কায় দ্রুত পাল্টাতে থাকা মূল্যবোধ, মেয়েদের সাবেকি ভালমন্দ কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণা, বর্হিজগতের সঙ্গে তার নিত্যনিয়ত সংঘাত, এমনকী বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকের বস্তুপ্রয়াসী ক্রমশ একা-হতে-থাকা স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তির সঙ্কট—এক দীর্ঘ জড়ানো পটের মতো চিত্রণ পাই আশাপূর্ণার লেখায়। মেদিনীপুরের পটুয়া মেয়েটির মতোই, আশাপূর্ণার শব্দবলি উন্মোচিত করে চলে ছবির পরে ছবি। একটি চিত্রময় ধারাভাষ্য তৈরি হয়ে ওঠে।

ছোটদের গল্প দিয়ে আশাপূর্ণার রচনাজীবন শুরু। হয়তো সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল তাই-ই। একটি প্রায়-কিশোরী ঢুকে পড়েছেন 'বড়দের' সংসারে। সেখানে যা নিয়ম আর যা আচরিত—দুইয়ের মধ্যেকার অসামঞ্জস্য বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে অথবা জোগাতে পারে কৌতুক। স্নিগ্ধস্বভাব আশাপূর্ণার কলম বাছল দ্বিতীয় পথটিকে। তাই 'আরো ভালো' গল্পের ঠাকুমার নাতনিকে দেওয়া ঐশ্বর্য এক টাকাটি বাবা 'আরো ভালো' কোনও কিছুতে লাগাতে চান। 'আজেবাজে ইচ্ছে মেটানো'র বদলে মেয়েকে কিনে দেন ছুঁচ, 'এক পয়সার চারটে, চৌষট্টি পয়সায়...' কাজে লাগবে এই নীতিতে। 'ফস্কা গেরো' কী 'ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা'র মতো অজস্র গল্পে কৌতুক ফুটে ওঠে সেই 'বেচারিদের' হিসেবি ভাবনা নিয়ে যারা নিজেদের লাভক্ষতির অঙ্ক দিয়েই

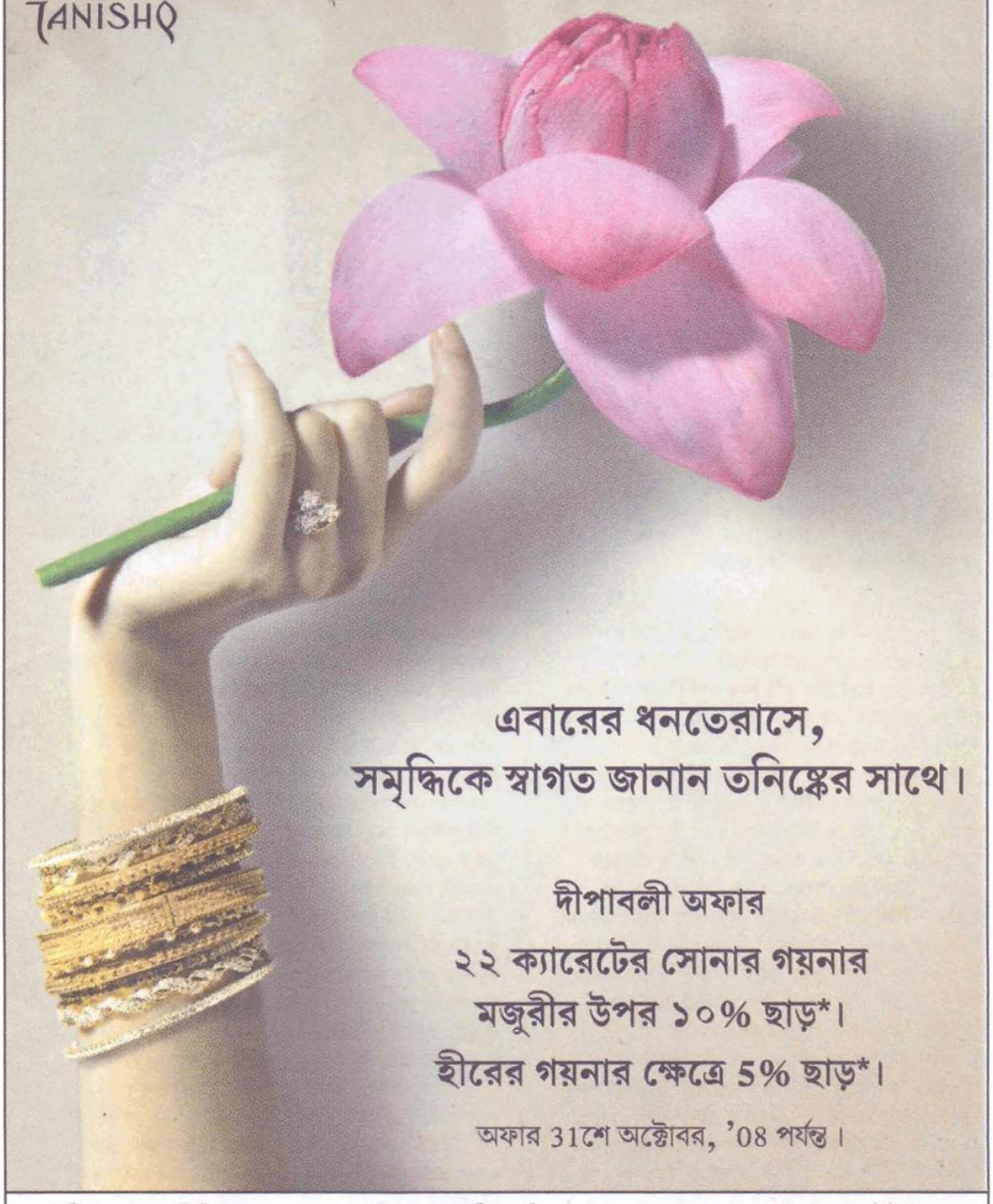

*শর্তাবলী প্রযোজ্য। প্রতিটি অলঙ্কারের ক্ষেত্রে সেটির সোনা ও হীরের বিশুদ্ধতার প্রমাণপত্র পাওয়া যাবে ''হাউস অফ টাটা''-র পক্ষ থেকে। আমাদের অনবদ্য গোল্ডেন হার্ভেস্ট সেভিংস স্কীমটির সুযোগ নিন। আমাদের ওয়েবসাইট : **www.tanishq.co.in**

Tanishq Showrooms at : Fort Knox, 6, Camac Street, Ph.: 22827910 / 7768 / 65501539 / 64515330 • **Kankurgachi :** P-308, C.I.T. Road, Scheme VI -M, Kankurgachi, Ph.: 23649529/ 30/ 31 • **Gariahat :** 9/3A, Gariahat Road (Near Ballygunge Phari), Ph.: 24603065/ 3067

'ক্ষণমুহূর্ত'—পরম ঔৎসুক্যে কিছু শুনছেন

সমস্ত খোলা পৃথিবীকে আড়াল করে ফেলে। কিংবা 'কী করে বুঝবো'র মতো অসামান্য গল্প যাতে বাড়িতে বেড়াতে আসা আত্মীয়াদের সামনেই বড়দের সমস্ত অনুচ্চার্য কথা বলে দেয় দু'টি শিশু। অতিথি আপ্যায়নের মিষ্টিকথার মাঝখানেই অবাক হয়ে বলে, 'এক্ষুনি যে তুমি ওপরে দিদাকে বলছিলে—বাবা, কি নচ্ছার ছেলে! চোখের নিমেষে পিরিচটা ভেঙে ছত্রখান করল'; বলে 'বললে যে, সিনেমার টিকিট কাটা, দেরি হয়ে যাবে, মাসিরা আর বেড়াতে আসার দিন পেল না!' আর শেষ পর্যন্ত সেই অতিথিদের কথার উত্তরে 'বারে, কী করে তাড়াতাড়ি করবে? তোমরা গেলে তোমাদের নিন্দে করবে না? তাতেই তো আরও দেরি হয়ে যাবে।' ফল যা হওয়ার তাই হয়। গোমড়ামুখে বিদায় নেন অতিথিরা। মায়ের হাতে 'তুলো ধুনো' হওয়া বাচ্চারা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে। বড়রাই তো সর্বক্ষণ শেখায় সত্যি কথা বলতে, 'কী করে বুঝব কোন সত্যিটা কখন বলব!'

সংসারের ভেতর দিককার এই যে রীতিনিয়ম লাভক্ষতি ভালমন্দের ছোট ছোট ছোট ভাগ, সাংসারিকতা সামাজিকতার নিয়মে 'সত্যমিথ্যা'র এই ক্রমাগত জায়গা বদল, এই অসামঞ্জস্যই আশাপূর্ণার ছোটদের গল্পগুলোর প্রধান অবলম্বন। বড়দের জন্য লেখারও বিষয়বস্তু সেই একই। কেবল সেই সমাজের সঙ্গে সমাজের মধ্যেকার মানুষগুলোর যে-সম্পর্ক, সেই দুঃখবেদনা ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে বড়দের গল্প উপন্যাসে, ছোটদের গল্পে সাধারণভাবে ধরা আছে ওই অসামঞ্জস্যের কৌতুকটুকু। যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে তবেই তার মধ্যেকার উদ্ভট হাস্যকরতা ধরা পড়ে, অন্যথায় তারই মধ্যে বাস করতে করতে তৈরি হয় বোধহীনতা।

তিনটি উপন্যাস জুড়ে যে সাগা আশাপূর্ণা বুনে তুলেছেন তা কাগজে লিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেতে সময় লেগেছে দশ বছর, ১৯৬৪-১৯৭৪। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় এই লেখা তাঁর মনে মনে তৈরি হয়ে উঠছিল তাঁর সমস্ত জীবন জুড়ে। স্মৃতির বয়স যদি জীবনের চেয়ে বেশি হয়, তা হলে জীবনের চেয়েও দীর্ঘকাল জুড়ে। বালিকা বয়সে আশাপূর্ণা সম্পূর্ণা দুই বোনে মিলে ঠিকানা জোগাড় করে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন একটি আবদার জানিয়ে, কবি যেন স্বহস্তে দুই কন্যার নাম লিখে দেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এসে পড়ল 'সাদা শক্ত কাগজের একখানি বড়মাপের খাম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে লিখেছেন'—দুই বোনের নাম। তারপর মার কাছে ছুটে যাওয়া। মা একটুক্ষণ সেই হাতের লেখাটার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে বললেন, 'তোরা পারলি? আমি শুধু স্বপ্নই দেখেছি।' সত্যবতীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দেখি না এই মা'কে? সত্যবতীর মা ভুবনময়ীর মধ্যে? সুবর্ণলতার গ্রামে থাকা ননদ সুবালার মধ্যে?

বিবাহিত জীবনের শুরুতে বইহীন অনেক 'ক্ষুধার্ত দুপুর' কেটেছে আশাপূর্ণার কেবল পঞ্জিকা পড়ে, কারণ সে বাড়িতে মোটা বই বলতে কেবল ওই একটাই। তাঁর মায়ের আলাদা সংসার পাতার সাধ, মূল কারণ সারাদিন বই পড়ার স্বাধীনতার। সংসারের 'মেজবউ' সেই মায়ের স্মৃতিই কি 'মেজবউ' সুবর্ণলতার কাঠামো? যদিও অনেক পরিশীলিত অনেক গোছানো এই মেজবউ-এর জীবন। বাস্তবের যে বালিকা আশাপূর্ণা, তার পরিচয় ছিল 'দস্যি' 'ডাকাতে মেয়ে' 'পাহাড়ে মেয়ে' এমন সব নামে। তারপর সেই মেয়ে কিশোরীবয়সে ঘোমটা টেনে পুরস্কারের বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল

Rhythm®
ধূপকাঠি
জীবনের প্রতি ছন্দে

শুভ দীপাবলির অভিনন্দন,
ছন্দে, বর্ণে, সুগন্ধে কাটুক সারাজীবন

cinnamon.info@yahoo.co.in

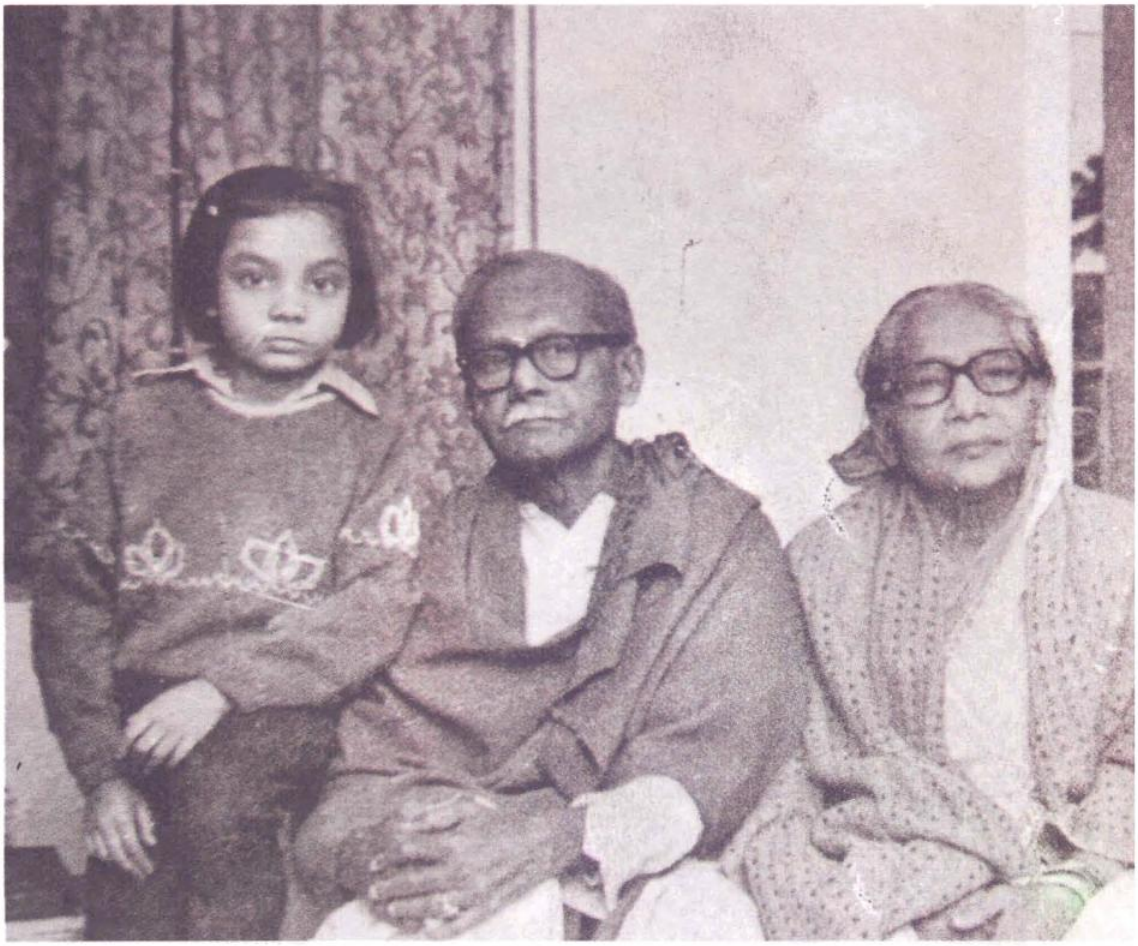

'চাওয়া পাওয়া'—পরিবারের সান্নিধ্যে আশাপূর্ণা দেবী

মফস্বলে। কেমন ছিল সেই বাস? ছাপার কাগজে গল্প কবিতা লেখা বউটিকে কেমন ভাবে নিয়েছিল তার বৃহৎ পরিবার? তার সমাজ? পরবর্তী 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' 'সুবর্ণলতা'য় পাব না আমরা সেইসব মানুষদের, যেমন ভাবে পেয়ে যাচ্ছি, দুই উপন্যাসেই গিরিবালা তাঁতিনীকে, তার তাঁতের ঝুলি আর কথার ঝুড়িসুদ্ধই। স্বনামে।

এসব কথার ইশারা এমন নয় যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' বা 'সুবর্ণলতা' আশাপূর্ণার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। বরং দেখার কথা এই যে আশপাশ থেকে, ঘর-বাইরে থেকে দেখাশোনা চরিত্ররা, দেখাশোনা ঘটনাই উঠে এসেছে তাঁর লেখার ভুবনজুড়ে। এমন সব ঘটনা, যা এর আগে লিখে রাখার কথা ভাবেনি কেউ। 'তিনযুগের পৃষ্ঠপটে আঁকা এই তিনকন্যার ছবিই আমার এই সাহিত্যজীবনের প্রধান ফসল'—'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'—এই ত্রয়ী উপন্যাস সম্পর্কে বলেছিলেন আশাপূর্ণা স্বয়ং। সুদীর্ঘ এই তিনটি উপন্যাসের বিষয় একটা দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের জীবন। গ্রামের বর্ধিষ্ণুতা ও দারিদ্রে, ধীরে ধীরে শিক্ষিত সমাজের শহরের দিকে সরে আসার চেষ্টায়, সমাজের মধ্যে ঘটতে থাকা সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে কেমনভাবে কাটছিল সেইসব পরিবারের মেয়েদের জীবন? যা কিনা আবার সমাজের অর্ধেকের বেশি সদস্যের জীবন? এর আগে পর্যন্ত অন্তঃপুর, যা আসলে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন, তার আচার-বিচার, ধ্যান-ধারণা তৈরি হয়ে ওঠার জায়গা, বাংলা উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে অস্পষ্টভাবে। এমনকী 'যোগাযোগ'-এর মতো নারীর অন্তর্জীবন প্রধান বইতেও মধুসূদনের শুধু নয়, বিপ্রদাসেরও অন্তঃপুর খুব অস্পষ্ট। আবছা অন্ধকার হীনস্বাস্থ্য কুসংস্কারমণ্ডিত এক জগত। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মূল উপজীব্য এই অন্তঃপুর জীবনই, কিন্তু চরিত্রগুলি সেখানে প্রায় সাদাকালোর বিভাজনরেখায় চিহ্নিত। নায়িকা চরিত্রগুলো আলোর পিপাসার বেদনায় মাখা, বাকি সমস্তটা শুধু একটা যন্ত্রণা দেওয়ার যন্ত্র। তার প্রধান কারণ হয়তো এই যে, জায়গাটা দেখা হচ্ছে পুরুষের চোখ থেকে। তার কাছে সংসারের ভেতর দিকটা, তার খাওয়া-শোয়া, জন্ম-বিবাহ মৈথুনব্যবস্থা, সমস্তটাই পুরুষের কাছে কিছুটা 'অপর' ও 'ওদের ব্যাপার' বলে প্রতিভাত, যা থেকে কিছুটা দূরে, একটু উঁচু জায়গায় থাকার স্বাধীনতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষকে দেয়। সংবেদী পুরুষ লেখক, সে জগতের বেদনার কথা সাজিয়ে লিখেছেন, বিস্তারে লিখেছেন, কিন্তু নিজেকে তার ভেতরে রেখে লেখেননি। তাঁদের নিজেদের অস্তিত্ব সেখানে চিহ্নহীন। জগদীশ গুপ্ত কী

সতীনাথ ভাদুড়ির মতো লেখকের লেখাতেও সমাজ আসলে বাইরের সমাজ। একজন বিলুর মা একজন রঙ্গপ্রিয় কলাবতী কী কঠিন চরিত্রের স্ত্রীলোক সেখানে বাইরের দিক থেকে দেখা চরিত্র। ব্যক্তিচরিত্র।

সাহিত্যের এই পুরুষতান্ত্রিক ঘরানা এতটাই গৃহীত হয়েছিল সমাজে যে মহিলা সাহিত্যিকরাও লিখছিলেন ওই একই জায়গা থেকে। হয়তো মেয়েদের জীবনই চিত্রিত হচ্ছিল তাঁদের লেখায় কিন্তু সেও বাইরের দিক থেকেই দেখা, 'সামাজিক কুপ্রথার বলি' মেয়েদের জীবন।

আশাপূর্ণার একের পর এক গল্প উপন্যাস, বিশেষত তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' 'সুবর্ণলতা' পরতে পরতে খুলে দেখাল সেই অন্তঃপুরের নিজস্ব জীবন। সবচেয়ে বড় বিশেষতা এইখানে যে, সে-জীবনকে দেখছে সেখানকারই এক বাসিন্দা। ভালমন্দে, হতাশা কী চরিতার্থতায়, দিনরাত্রির প্রহরে প্রহরে আলো পড়ছে মুখগুলোর ওপর। বাইরে থেকে সন্ধানী সার্চলাইটের আলো নয়, দিনযাপনের স্বাভাবিক আলো। যে দেখাচ্ছে সে নিজেও আছে ওইখানেই। সে নিজের দেখাই দেখাচ্ছে। সেই দেখাতেই ভিন্ন হয়ে উঠেছে সমস্ত আখ্যান। পাঠিকা অনেকটা বিহ্বল বিচলিত হয়ে অভিভূত প্রশ্ন করেছেন, 'আমার কথা আপনি জানলেন কী করে?' আর পাঠক হয়তো ঈষৎ অস্বস্তিতে ভেবেছেন 'ঈস্, এরকম দেখায় নাকি আমাকে, আমার কাজগুলোকে!'

কিন্তু সেই দেখা আর দেখানোর মধ্যে বিদ্বেষ কোথাও নেই। কী হওয়া উচিত তার কোনও সমাধান বা পথনির্দেশের চেষ্টা নেই, আছে কেবল শিকলগুলোর ওপর আলো ফেলা। ব্যক্তি পুরুষের সঙ্গে ব্যক্তি নারীর সম্পর্কের অসমতা যে সমস্যার মূল নয়, প্রকাশ মাত্র, সমস্যার মূল সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের ক্ষমতাঘটিত সম্পর্ক—একথা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষার ফলে, আশাপূর্ণার কাছে খুব পরিষ্কার। তাই তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে ক্ষমতাহীন বউ-ঝিউড়িদের, তরুণ কিশোর ছেলেদেরও কিছুটা শাসনপীড়ন করেন কিন্তু মোক্ষদা এলোকেশীরা। যদিও 'গতর গেলে' তাঁদের 'দবদবা' ফুরোনো করুণ চেহারার মধ্যে দিয়ে তাদের ক্ষমতার অন্তঃসারশূন্যতাও প্রকট হয়ে ওঠে। আবার রামকালী কবরেজ-এর মতো আদর্শ প্যাট্রিয়ার্ককেও দীর্ঘপথ নিজ মতে চলে আসবার পর থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয় অপ্রত্যক্ষে থাকা 'মেয়েমানুষদের জগত'কে আর একটু মন দিয়ে দেখা দরকার ছিল। কোথাও একটা খুব বড় ফাঁক রয়ে গিয়েছে। এই ফাঁকার জায়গাটি আরও স্পষ্ট করে বলে সুবর্ণলতা, "কেন ব্যর্থতা জানো ঠাকুরপো? তোমাদের সমাজের আধখানা অঙ্গ পাঁকে পোঁতা বলে। আধখানা অঙ্গ নিয়ে কে কবে এগোতে পারে বল? এ অখাদ্য অবাদ্য মেয়েমানুষ জাতটাকে যতদিন না শুধু 'মানুষ' বলে স্বীকার করতে পারবে—"।

নারীচেতনাবাদের এই প্রাণবাক্য, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ১৯৬৪-'৬৭ সালে উচ্চারিত হচ্ছে এমন একজন মানুষীর মুখ থেকে বিশ্বপৃথিবীর তাত্ত্বিক দর্শনের পঠনপাঠন যাঁর প্রায় নেই। উচ্চারিত হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন উত্তম্যানিজমের ধারণা আলোচনা ক্ষেত্রে আসতে অন্তত দুই দশক বাকি। 'সত্য', 'সুবর্ণ' এবং আরও শ'খানেক উপন্যাস এবং সহস্রাধিক ছোটগল্পের মেয়েরা, কোনও উচ্চকিত নাটকীয়তা ছাড়াই, নিজের নিজের ভুবনে খুঁজে বেড়াচ্ছে স্বাধীনতা, মর্যাদা। আচরণ করে চলেছে মমতা সুরক্ষা সৃষ্টিশীলতা সাহস আর সৌন্দর্যবোধ। তিনি লিখছেন পরাধীন মেয়েদের দাসত্ব নিয়ে, স্বাধীন মেয়ের দাসত্ব নিয়ে, মুক্ত আলোকময় পূর্ণতার এক গভীর আকাঙ্ক্ষা থেকে।

আমরা, যে-মেয়েরা মেয়েদের চোখে সমাজকে ব্যক্তিকে পৃথিবীকে দেখি, মেয়েদের কলমে পৃথিবীর কথা লিখতে চাই, আশাপূর্ণা আমাদের পূর্বমাতৃকা। আরও এক পূর্বমাতৃকা কল্যাণী দত্তের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও প্রায় তিন দশক, 'থোড় বড়ি খাড়া' 'পিঞ্জরে বসিয়া'তে যিনি নিজের ধী ও মেধার আলো দিয়ে ওই পার হয়ে আসা পথ এবং অস্মিতাপথ খুঁজবার ইশারা ধরিয়ে দেবেন।

উচ্চণ্ড উন্মত্ত কোলাহলময় বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, 'স্বাধীনতা' 'স্বেচ্ছাচার' 'ক্ষমতাদখল' 'দাসত্ব' সব শব্দ উড়ে বেড়াচ্ছে শুকনো এঁটো পাতার মতো। ভিড়ে আর ধুলোয় কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না, তখন এই পূর্বমাতৃকা স্মরণ হয়তো আসলে একরকম আত্মানুসন্ধান, শিকড়ের সন্ধান।

গলায় দড়ি

আশাপূর্ণা দেবী

বিয়ের আট দিন না কাটতেই সত্যজিতের ছুটির দিন গেল কেটে।

দশ দিনের তো ছুটি—বিয়ের আগেই গেছে ক'দিন।...কাজের জায়গায় ফিরে যাবার আগের দিন সত্যজিৎ বায়না ধরে বসলো নতুন বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। অনাসৃষ্টি কথা। কনেবৌ এখনো অষ্টমঙ্গলায় বাপের বাড়ী যায়নি—'নিয়ে যাবো' বললেই নিয়ে যাওয়া হয়? এসব আপত্তি সত্যজিৎ ফুৎকারেই উড়িয়ে দিতে পারে।

—অষ্টমঙ্গলা! অষ্টমঙ্গলা আবার কি জিনিষ?

পিসিমা বললেন—হিঁদুর ছেলে হয়ে তাও জানিস্ না? আট দিনের দিন মেয়ে জামাই 'জোড়ে' যাবে—সুবচনী-মঙ্গলচণ্ডীর পুজো হবে।

—তা ওটা আজই সেরে নাও না।

—ক্ষেপা ছেলে! এসব হ'ল 'নেমকম্ম ব্যাপার', যা-তা করলেই হ'ল?

—আচ্ছা এই যে বললে—মেয়ে জামাই জোড়ে যায় না কি—তা জামাই হতভাগা তো 'জোড়'—ভেঙ্গে পগারপার হচ্ছে তার কি?

—বালাই ষাট! বলতে যদি মুখে কিছু আটকায়? কি করবি বাবা, যাবার তো কথা নয়—নেহাৎ নাকি সাহেবের চাকরী—ও মুখপোড়াদের শরীলে কি দয়াধম্ম আছে?

সত্যজিৎ হো-হো করে হেসে উঠল।

—তোমাদের মা মঙ্গলচণ্ডীর শরীলেও তো দয়াধম্মের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না পিসিমা? সাহেব মুখপোড়াদের মতনই কড়া আইন, দু'দিন আগু-পিছু হবার জো নেই।

—তা' বললে কি হবে, শাস্তর যে।

পিসিমা চলে গেলেন বটে কিন্তু রান্নাঘরে সত্যজিতের মায়ের কাছে গিয়ে যা বললেন সম্পূর্ণ উল্টো কথা সেটি। বললেন—ছোট বৌ, ছেলের সাধ হয়েছে বৌ নিয়ে বাসায় যাবে, তুমি অমত কোরো না বাপু।

সত্যজিতের মা চমকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—কার সাধ হয়েছে? সতের?

—হাঁগো, আমার কাছে বললে কি না পিসিমা তোমাদের বৌমাটিকেও নিয়ে পালাচ্ছি'—আহা বেটাছেলে বড় হয়েছে—ইচ্ছে হবে বই কি—হবে না? কাল ফুলশয্যা হয়েছে আর আজই দেশান্তরী, এ যেন মুখের 'গেরাস' কেড়ে নেওয়া।

সত্যজিতের ছোট বোন মার কাছে বসে রুটি বেলছিল, বেলুন ফেলে রেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে এমন হাসতে সুরু করলো যে বেলুন গড়িয়ে গিয়ে লাগল ভাতের হাঁড়ির গায়ে। মা বিরক্ত হয়ে বললেন—অশোকা, ও কি? হেসে মরছিস্ কি জন্যে?

মনে বুঝছিলেন বৌয়ের সঙ্গে মুখের গ্রাসের তুলনাটাই অশোকার হাসির উৎস উৎসারিত করে তোলবার কারণ, নিজেও হয়তো হেসে ফেলতেন যদি এইমাত্র এরকম একটা অপমানকর প্রস্তাব না শুনতেন।

অপমানকর বৈ কি, দস্তুরমত অপমান।

ছেলের মুখ থেকে বৌ নিয়ে বাসায় যাবার প্রস্তাবটাই তো যথেষ্ট অপমানের, তার ওপর কি না তিন দিন মোটে বিয়ে হয়েছে যে ছেলের। অশোকা কিন্তু মার বকুনিতে কান দিলো না, প্রায় তেমনিই হাসতে হাসতে বললো—দাদা বুঝি তোমার কাছে দুঃখ করছিল পিসিমা? আহা মরে যাই—'মুখের গেরাস' কেড়ে নেওয়া—

—হেসে মরলো মেয়ে—পিসিমাও দন্তবিহীন হাস্যে বলেন—দুঃখ করতে যাবে কেন লা? হাসতে হাসতেই বলছিল—'পিসিমা, বৌকে ফেলে রেখে যেতে মন সরছে না—নিয়েই যাই।' আমি বলি—আহা তা' যাক। এখনকার ছেলেমেয়েদের তো বয়েস-কাল গড়িয়ে গিয়ে বিয়ে, লজ্জা-সরম করবে কবে? আমি বলি—কনে বৌমাকে তুমি পাঠাতে গররাজী হয়ো না ছোট বৌ। আহা ছেলেটা মুখখানি চুন করে বেড়াচ্ছে—

—সতু তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে ঠাকুরঝি—বলে আরব্ধ কাজে মন দেন সত্যজিতের মা।

এতখানি ওকালতির পর এভাবে মামলা ডিস্‌মিস্ হওয়ায় পিসিমা বিলক্ষণ চটে যান। তবে বিরক্তি গোপন করেই বলেন—ঠাট্টা করতে যাবে কেন ছোট বৌ? আমি কি ওর ঠাট্টা-তামাসার যুগ্যি? এই যে বাছাকে হাতের সুতো খুলতে না খুলতে চলে যেতে হচ্ছে—এতে কি তোমারই মন সরছে?

এক-কালে পিসিমাই এ রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। দাপটও নেহাৎ কম ছিল না। তাঁর ভয়ে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল না খাক্, অধস্তন ব্যক্তিরা বাঘের মতই ভয় করতো তাঁকে। দু'চারটি সন্তানের পিতা হয়েও—ছোট ভাইরা দিদির সামনে মুখ তুলে কথা কইতে সাহস করতো না। বিরুদ্ধাচরণ তো দূরের কথা।

কালের গতিকে—সেই সদাসন্ত্রস্ত কম্পমান-বক্ষ ভাইবৌরা ও ছোট ভাইরা যে কী করে হঠাৎ দিব্যি 'একজন' হ'য়ে উঠলেন সে এক আলাদা রহস্য। এখন ভাইরা যে অবহেলা করেন তা' নয়, তবে ভয়ও করেন না, সেটা বলাই বাহুল্য। ভয়ের জায়গায় একটু সস্নেহ করুণা। "বাবা রে, দিদি রাগ করবেন"—এ ভাবের পরিবর্ত্তে "আহা দিদি দুঃখিত হবেন"—এই আর কি।

দাঁতের জোর চোখের জ্যোতি এবং কোমোরের বলের সঙ্গে সঙ্গে যে গৃহিণীত্বের মর্য্যাদাও হারিয়েছেন, একথা পিসিমা নিজেও অনুভব করেন বৈ কি। তাই তাঁর কথায় আজ আদেশের পরিবর্ত্তে ওকালতির সুর। তবে বয়সের দোষে অসহিষ্ণুতা আসবেই, অসহিষ্ণুতা আর অবুঝপনা।

যেই মনে হ'ল—'আহা সতুর ইচ্ছে হয়েছে'—ব্যাস্ সতুর ইচ্ছের সপক্ষে রাশি রাশি যুক্তি সংগ্রহ করতে সুরু করলেন। যুক্তির অভাব কি? বললেন—এই তো কত দুঃখে ছুটি পেয়েছে—আবার কবে আসবে তা'র ঠিক কি? বৌকে ওর কাছে পৌঁছে দিতে যাবে কে তাই বল?

—তিরিশ বছর বৌ নইলে চলেছে আর তিনটে মাস

চলবে না?—সতুর মা রুটির চাটু নামিয়ে কড়া চাপিয়ে দেন...ভাবটা যেন—এই অসম্ভব বাজে কথাটার জন্য হাতের কাজ কামাই দিয়ে কথা কইবার দরকার নেই।

—সে তো কথাই আছে ছোট বৌ, 'বিয়ে করলে আর বৌ নইলে ঘর চলে না'—বিয়ে করেনি সে এক রকম ছিল—এখন যতই হোক আস্বাদ পেয়েছে—

অশোকা আর একবার হাসতে হাসতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে—

—ও পিসিমা, বৌকে যে খাবার জিনিষ বানিয়ে দিচ্ছ?

—খাবারই জিনিষ লো, বিয়ে হলে বুঝবি। বলে আবার একবার হেসে ফেলেন পিসিমা।

বয়সের আকাশ-পাতাল ব্যবধানে—পিসিমা ঠাকুরমার পর্য্যায়ে পড়ে গেছেন প্রায়।

—তাহলে ছোটবৌ, নতুন বৌমাকে কাল সকালে একবার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে ধুলো-পায়ে ঘরবসত করিয়ে আনো?

—'ও সব তুমিই কোরো না ঠাকুরঝি, তোমারই তো করবার কথা?' বলে সমস্ত কথার ইতি করে দিয়ে তেলের কড়ায় প্রবলভাবে 'ছ্যাঁক-ছোঁক' সুরু করে দেন সত্যজিৎ জননী।

পিসিমা বুঝলেন—এ রাগের কথা। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।...ছোট বৌ কথা কয় কম কিন্তু কথার ওজন আছে।

অথচ এমন দিন ছিল, ভাই-পো ভাইঝিরা যত অন্যায্য আবদারই করুক, পিসিমা তাদের সপক্ষে থাকলে তাদের মায়ের টুঁ শব্দ করবার হুকুম ছিল না।

পিসিমা দোতলায় বেশী ওঠেন না, ওঠেন না কোমরের বলের অভাবেই। আজ এলেন কতকটা মনের বলেই।...

'নেমকম্ম' বা ঠাকুর দেবতার ব্যাপারেও যে গোঁজামিল চলে এ তথ্য পিসিমার অজানা নয়, অন্ধ স্নেহের ক্ষেত্রে তিনি প্রায় আধুনিকাদের মতই কুসংস্কারমুক্ত, কাজেই ভাবনা মঙ্গলচণ্ডীকে নিয়ে নয়, ছোট বৌকে নিয়ে।

যারা কথা কয় কম তা'দের ভয় না করে উপায় নেই।

—"ক্ষেত্তরকে বলে দেখি"—এইটুকু স্বগতোক্তি করে সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠে এসে হাঁফাতে লাগলেন।

"কেদার বদরীর" পথে পাহাড় ভেঙেছিল কে? পিসিমা নবতারা দেবী, না আর কেউ?

নতুন বৌয়ের আড্ডা দোতলায়, সে পিসিমাকে দেখতে পেলো। বুড়ো মানুষের কষ্ট দেখে; নিতান্তই দয়া-পরবশ হয়ে কাছে এসে বসলো।

বৌয়ের রূপ আছে—অস্বীকার করা যায় না। নিষ্প্রভ চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে পিসিমা ভাবলেন—এমন মুখখানি ছেড়ে কোন্ প্রাণে যায় বেচারা? অন্যায় ছোট বৌয়েরই, ছেলেকে যদি বৌ দেবার মতলব নেই তো সাতরাজ্য খুঁজে রূপসী বৌ আনা কেন?

—জলখাবার খেয়েছ বৌমা?

বধূ ঘাড় হেলিয়ে জানালো—হ্যাঁ।

—সতু তোমায় নিয়ে যেতে চাইছে যে—

বৌ মৃদু হেসে মুখ নীচু করলে।

—তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ তো শুনে খাপ্পা—

মুখ নীচুই থাকলো, শুধু হাসিটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

—ঠাকরুণটি তো সোজা নয়, ঘর করলে বুঝবে—পিসিমার সুর খাদে নেমে পড়ে—টেপামুখী, একজেদি, কখনও মন খুলে কিছু বলবে না—অথচ—

হঠাৎ স্তিমিত দৃষ্টি যথাসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বর উদারা মুদারা সব ছাড়িয়ে একেবারে তারায়। কিন্তু আমিও এই বলে দিচ্ছি—ওর কথা শুনতে আমার দায় পড়েছে! মনে করেছে ভারী গিন্নী হয়েছে! সেদিনের মেয়ে—বিয়ে দিয়ে আনলাম—ওর কথা আমি শুনবো কেন কনেবৌমা, বল তো তুমি?

বৌমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারিদিক্ চায়। বুড়ো মানুষের কাণ্ডজ্ঞান নেই, কি না জানি বলে বসবেন—অপরে ভাববে বৌ সায় দিচ্ছে বা। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে বলে—পাকা চুল তুলে দেব পিসিমা?

—না বাছা! আমি একবার যাই ক্ষেত্তরের কাছে। তা' তোমার মা বাপ অমত করবেন না তো?

—কি জানি।...সে সন্দেহ বৌয়ের নিজেরও ছিল না তা' নয়।

—অমত করলে শুনছে কে? মেয়েকে দান করে ফেললে আর কিসের জোর, অ্যাঁ। এখন সতু যা বলবে তাই শুনতে হবে। হবে কিনা বলো? তোমরা তো সব বুদ্ধিমতী, বিদ্বান মেয়ে, আইন জান তো! বৌ পিসিমার ভাষায় ভঙ্গিমায় আতঙ্কিত হলেও শেষের কথাটায় হেসে ফেলে। সতু কি এখুনি আইনের ঠ্যাঙা নিয়ে লড়তে যাবে, সদ্যলব্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে?

—হাসো আর যাই করো, আমার হুকুম রদ করুক দিকি কেউ?

গৌরবময় অতীতের ক্ষীণতম একটু স্মৃতি হঠাৎ পিসিমার চিত্ত উদ্দীপ্ত করে তুলেছে বোধহয়।

'ক্ষেত্তর' অর্থাৎ সত্যজিতের পিতার উদ্দেশ্যে মরতে মরতে তিনতলায় উঠে যান পিসিমা।

—ছোট বৌয়ের কোনো কথা আমি শুনতে চাইনে ক্ষেত্তর!

এ রকম গৌরচন্দ্রিকাহীন আকস্মিক আক্রমণে যতটা বিপন্ন হওয়া উচিত ঠিক ততটা হ'ন না ক্ষেত্রবাবু, কারণ দিদির স্বভাব তাঁর জানা। হাতের মোটা চুরুটটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে বলেন—সে আর তুমি কবে শুনতে চাও দিদি?

—কেন শুনবো? ও বড় না আমি বড়? বলুক ও?

ভ্রাতৃজায়ার অনুপস্থিতির সুযোগে এ রকম সাহস-ব্যঞ্জক কথা মাঝে মাঝে বলে থাকেন নবতারা।

ক্ষেত্রবাবু মনে যাই বলুন মুখে বলেন—ওদের কথা ছেড়ে দাও দিদি, তোমার মতন বুদ্ধি-বিবেচনা হতে এখন ঢের দেরী আছে।

—ও তোমার 'মুখভারতী' কথা! আসলে ওই বৌটিই তো হয়েছেন এখন তোমার ইষ্টগুরু! বুঝি না আর কোনটা? নইলে আর ও আমায় 'থো' করে রাখে? মরুক গে—এখন কথা হচ্ছে—সতুর যাওয়া নিয়ে—

—কালই তো রওনা হতে হবে ওকে।

—সে আমি জানি, সে কথা নয়। আমি বলি কি,

বৌমা যাক ওর সঙ্গে বাসায়।

—বৌমা? নতুন বৌমা?

—বৌমা আবার তোর কটা আছে ক্ষেত্তর? নতুন বৌমার কথাই বলছি।

—এখন যাবে কি বল? ক্ষেত্রবাবুর কণ্ঠে অসন্তোষের সুর।

—সে আমি জানি—তুই বলবি ও কথা। অথচ নিজে তো এখনো বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বৌ ছেড়ে থাকতে পারিসনে—

নবতারা রাগ ভরে বাতগ্রস্ত কোমরের যন্ত্রণা ভুলে বেশ বীর বেগেই ঘর ছেড়ে চলে যান।

তাঁর কথা আর কেউ-ই গ্রাহ্য করে না।...অনেক দিন থেকেই এ রকম হয়েছে, কিন্তু নতুন বৌয়ের সামনে নিজের প্রতিপত্তি হ্রাসের প্রমাণ প্রকাশ হওয়ায় বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েন নবতারা। তাছাড়া সতু? হাজার হোক নতুন বিয়ের বর, মুখ ফুটে কি আর বলতে পারবে মা-বাপের সামনে? কত ভেবে-চিন্তে পিসিকে সুপারিশ ধরেছে—ছোটবেলায় বারোয়ারীর যাত্রা দেখবার, মেলায় পাঁপড়ভাজা খাবার বা স্কুলের সরস্বতী পুজোয় মোটা চাঁদা দেবার সখ হলে—যেমন পিসির সুপারিশ ধরে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতো।

মেয়েরা—যারা বিয়েতে এসেছে, তারা মনের সুখে দায়িত্বহীনতার সুখ উপভোগ করে নিতে এই সকালবেলাই শুয়ে বসে গান গল্প করছিল, পিসিমাকে দেখে কেউ বা ঈষৎ সন্ত্রস্ত হল, কেউ হল না।

নবতারা গম্ভীর ভাবে বলেন—তোদের বাপ-মার আক্কেল দেখলি!

—কেন গো পিসিমা?

—বলি ছেলে-মেয়ের সুখ-দুঃখ না বুঝলে আবার কিসের মা-বাপ?

—আমিও তো তাই বলি পিসিমা, কিসের মা-বাপ তবে?

কথাটা বলে সুলেখা অলক্ষ্যে বাসন্তীকে একটা চিমটি কাটে।

—তোরা আমার কথায় উপহাস্যি করিস্ তা' জানি।

বোঝা গেল, বুড়ো হলেই যে বোকা হয়ে যায় মানুষ তা' নয়।

—সে কি গো পিসিমা, কি যে বল!

—বলছিলাম—নতুন বৌমাটি তো দিব্যি ডাগর-ডোগর?

—তা দিব্যি।

—তবে আর এখন বাপের বাড়ী যাবার কি দরকার? কচি খুকী তো নয়—যে মার জন্যে কাঁদবে?

—সে ত বটেই পিসিমা, এই একবার ঘুরে আসুক, তার পর এখানেই থাকবে।

—এখেনে থাকবে?

পিসিমার বিরক্তিব্যঞ্জক প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে যায় বাসন্তী, তাঁর মতলবটা ঠিক বোঝাও যাচ্ছে না এখনো। বললো—বরাবরই কি আর থাকবে? যাওয়া-আসা করবে—মার এখন শরীর খারাপ—আমরা তো যে যার শ্বশুরবাড়ী চলে যাবো, বৌটি না থাকলে চলবে কেন?

—তা' বেশ। কালনেমির লঙ্কাভাগ হয়ে গেল। কথায় আছে না 'যে এল চষে সে রইল বসে'—তোদের হয়েছে তাই। বলি যে ছোঁড়া বিয়ে করলো—তার কথা তো কেউ মুখেও আনছিস না?

তিন বোন বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পর মুখ-চাওয়া-চায়ি করে! ব্যাপার কি? যে পিসিমা 'এখনকার মেয়ে-ছেলেদের বেহায়াপনার' জ্বালায় যখন তখন হার্টফেল করতে বসেন, তিনি হঠাৎ নবদম্পতির রাইট নিয়ে ফাইট্ করতে নেমেছেন মানে?

সুলেখা একটু বেশী সাহসী, সে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বলে—তা'হলে দাদা নতুন বৌকে পকেটে করে নিয়ে যাক দিল্লীতে।

—যাবেই তো। যাবেই তো নিয়ে! কেনে যাবে না শুনি? সময়ে বিয়ে হলে পাঁচটা ছেলের বাপ হ'ত না? এখনও আবার পাঁচ বছর মা-বাপের কাছে বৌ ফেলে রাখবে কেন? বাছার আমার সেখানে কষ্টের এক-শেষ—একগাদা টাকা উপায় করে, ভালো খেতে পায় না। হ্যাঁ, যাবে বৌ নিয়ে! আমি বলছি, দেখি তোর মা-বাপ আমার ওপর কি করে কথা কয়?

ব্যাপারটা এই, নবতারা যদি এক কথাতেই কথার সায় পেতেন, হয়তো বেশী উৎসাহিত হতেন না এ নিয়ে, কিন্তু প্রত্যেকের কাছে বিরুদ্ধবাদ শুনে শুনেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছেন। তাঁর প্রস্তাবটা যে নিতান্তই অযৌক্তিক, এ কথা মেনে নেওয়াও তো কম অপমান নয়?

ঘটনাটা ঘটাবার জন্যে কি কৌশল অবলম্বন করা যায় তাই ভাবতে থাকেন।

ধরো যদি নবতারা নিজেই যেতে চান সতুর সঙ্গে? কেন বুড়ো পিসি ঠাকুরমাকে কেউ কি দেশ-বিদেশে নিয়ে যায় না? বেশ তাই যদি যান নবতারা—একলা তো আর যাবেন না? সঙ্গে একটা মেয়েমানুষ তো থাকা চাই? বিধবা মানুষ, একাদশী দ্বাদশী আছে, শরীরের কথা বলা যায় না, কখন কি হয়—সতু তো সারাদিন বাইরে থাকবে। তবে? কে যাবে তবে, এক নতুন বৌ ছাড়া? মেয়েদের কথা শুনলে হাড় জ্বলে যায়। পাঁচ দিনের জন্যে নেমন্তন্নে এসেছে সব, এর মধ্যে না হ'ক পঞ্চাশ বার জামাই ব্যাটারা এসে ধর্ণা দিচ্ছে! দাদার বেলায় হুঁস নেই!...

আচ্ছা—ভগবান না করুন, সতুরই যদি একদিন অসুখ-বিসুখ করে? কে একটু কাছে বসে? কে একটু যত্ন-আত্তি করে? কই মা কি নিজের সংসার ফেলে, সোহাগের কত্তাটিকে ফেলে, ছেলের কাছে গিয়ে থাকতে পারে? এই যে ছেলের খাওয়াদাওয়ার এত কষ্ট? হঠাৎ সতুর কল্পিত রোগশয্যার পাশে সেবা এবং সেবিকার অভাব রীতিমত পীড়িত করে তোলে নবতারাকে।...নাঃ বৌমাকে তিনি দেবেনই পাঠিয়ে—সতুর মুখে হাসি ফোটাতে।...ছেলেবেলায় যেমন বাপ-মার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কোন নিষিদ্ধ খাবার বা খেলনা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নিজের আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন নবতারা!

নতুন বৌয়ের কাছে এসে চুপি চুপি বলেন—বৌমা শোন বাছা, বলি এক কথা।

বৌমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালো...চুপি চুপি কথাতে ওর ভারী ভয়, কে কি ভাববে বাবা।

'দুই নারী'—আশাপূর্ণা দেবী ও ড. রমা চৌধুরী

পিসিমা আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন—শোনো তা'হলে, আমার জবানীতে তোমার মাকে একখানি পত্তর লেখো। লেখো—"সাবিত্রীসমানাষু—কল্যাণীয়া ভাই বেয়ান, তোমায় লিখি এই যে—শ্রীমান্ সত্যজিৎ বাবাজী আগামী কল্য দিল্লী রওনা হইবেক, আমার ইচ্ছা বধূমাতাকেও বাবাজীবনের সহিত রওনা করাইয়া দিই। সে কারণ তুমি পত্রপাঠমাত্র যাহাতে—"ধুলাপায়ে ঘরবসত" সুবচনী মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি নিয়ম কর্ম্মাদি কল্য প্রভাতেই সারা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেক। অন্যথা না হয়। কারণ"—

বৌ হাসি চাপবার গোপন চেষ্টায় মাথাটা যত ইচ্ছে নীচু করে বলে—আর কাউকে বলুন পিসিমা।

—না না, আর কাউকে আমার বিশ্বেস নেই বাছা! ছুঁড়িগুলো কি সোজা? বললে এখন কতো হাসবে—ন্যাকরা করবে—মা বাপের কানে তুলবে—তিলপ্রমাণ কথা তালপ্রমাণ করে ছাড়বে! এমন নয় বাবা!

—আমার ভারী লজ্জা করছে পিসিমা।

—লজ্জার কিছু নেই মা। তুমি তো আর আপনা থেকে বলছো না? আমার জবানী। আচ্ছা নয় সতুর নামের সঙ্গে 'বাবাজীবন' লিখো না। এমনি দাও।—না বাছা, পাঁচকান কোরো না, তুমি টুক্ করে লিখে দাও, আমি ক্ষেন্তিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই।

বলা বাহুল্য, পিসিমার অভয়বাণী বধূকে কিছুমাত্র

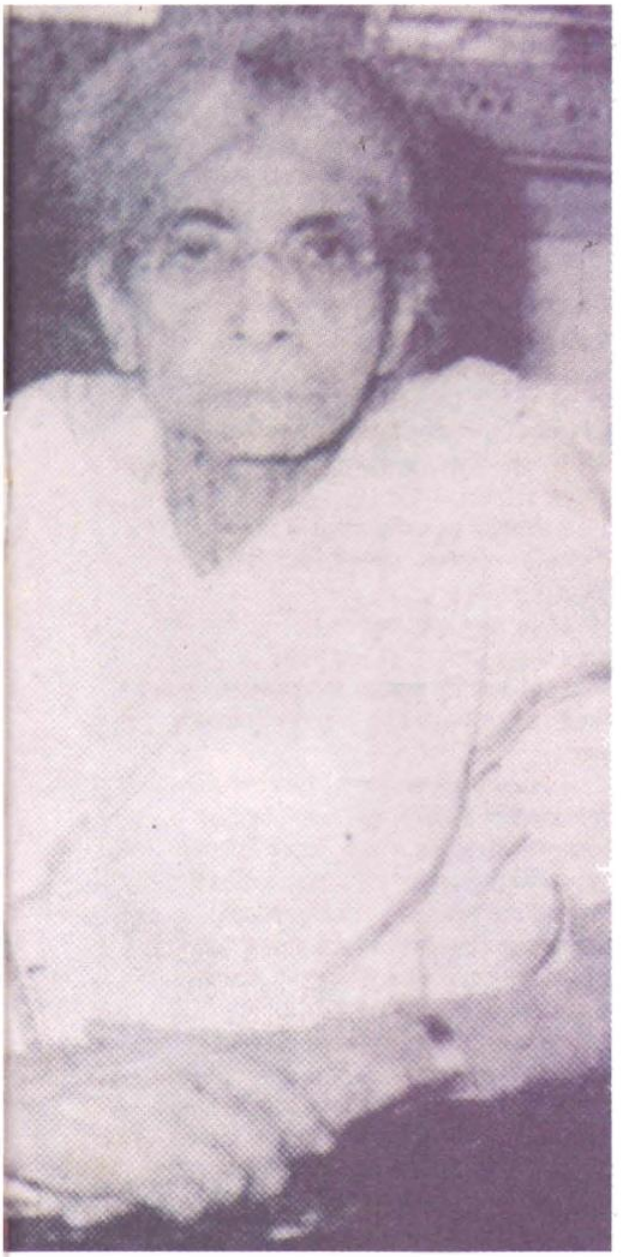

ভরসা দিতে পারে না। নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্তের মত তাঁর হাত এড়াবার কৌশল চিন্তা করে। ঠিক এই সময় বিপদহারী মধুসূদনের বেশে সত্যজিতের আবির্ভাব। আপন আনন্দে টগবগ করতে করতে আসছে, লক্ষ্যই করেনি পিসিমাকে। সহাস্যে বধূর উদ্দেশে বলে, বলে এলাম তোমার মাকে। শুনে তো—হঠাৎ বৌয়ের ঘোমটা টানার বহরে লক্ষ্য পড়লো। ঘরে পিসিমা!

অপ্রতিভ হবার ছেলে সত্যজিৎ নয়; তা'ছাড়া পাঁচ বছর বিদেশে চাকরী করে উন্নতিও হয়েছে বৈ কি। কণ্ঠস্বরকে 'কন্ট্রোল' করবার চেষ্টামাত্র না করে বলে ওঠে—এই যে পিসিমা—বলে এলাম শাশুড়ী ঠাক্‌রুণকে! বাবা, তুমি তো তোমাদের ঐ সব ধম্মকম্ম পূজোপাঠের কথা শুনিয়ে একেবারে ঘাবড়ে দিয়েছিলে আমায়। উনি শুনে তো কই কিছুই বললেন না। বরঞ্চ খুব খুশী! বললেন "তোমার সঙ্গে পাঠাবো তার আবার বলবার কি আছে বাবা?" আমিও তাই ঠিক করে ফেললাম—এই যে বাসু, সুলেখা, তোদের বৌদির ট্রাঙ্ক সুটকেসগুলো গুছিয়ে রাখ, ওকে নিয়েই যাব ভাবছি। ছুটি পাওয়া তো সোজা নয়।...যাই কিছু মার্কেটিং বাকী আছে, ঘুরে আসি!—বলে বাসন্তীর কোলের শিশুটির নাকটা একবার নেড়ে দিয়ে, অশোকার খোলা চুলের গোছায় এক টান মেরে চটপট সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় শিস্ দিতে দিতে।

যেন শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের মত পাওয়াটাই চরম। আর কোনো সম্মতি অসম্মতির প্রশ্নই ওঠে না।...বোধ করি সেই ভীতিকর এবং অপ্রীতিকর অবস্থাটা চোখ বুজে এড়িয়ে যাবার জন্যেই এই অন্যমনস্কতার ভান সত্যজিতের।

ভাবটা যেন—ছুটি নিয়ে বিয়ে করতে এসেছে—বৌ নিয়ে ফিরে যাবে—এ তো জানা কথাই, এতে বলবার আবার আছে কি? দুর্ভাবনা ছিল শাশুড়ী ঠাক্‌রুণকে নিয়ে, যাঁর আদরের দুহিতাটিকে বেদখল করে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সম্মতিই যখন পাওয়া গেছে তখন আর কি করবার আছে? শিস্ দিতে দিতে মার্কেটিং করতে যাওয়া ছাড়া?

যাক নবতারা তা'হলে বাঁচলেন?

যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতটা অতিক্রম করবার চিন্তায় অস্থির হয়ে এত ফন্দী-ফিকির খাটাতে বসেছিলেন—সতু সেটা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলে ওটা পর্ব্বতও নয়, দুর্লঙ্ঘ্যও নয়, কাল্পনিক ছায়ামাত্র।

অন্ততঃ পিসিকে আর ভাইপোর ন্যায্যদাবী আদায়ের জন্যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে হবে না সেটা ঠিক। কিন্তু এত পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়ে নবতারাকে খুব কি সন্তুষ্ট করতে পারলো সতু?

মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না।

হঠাৎ যেন প্রধান অভিনেতাকে কাটা সৈনিকের পার্ট দেওয়া হয়েছে।

বাসন্তীরা হাসাহাসি করতে পারে—"ক্ষেত্তর-দম্পতি" বিরক্তি প্রকাশ করতে পারেন, নবতারা বেচারার যে কিছুই করবার নেই। কলির মেয়ে-ছেলের অকথ্য নির্লজ্জতা দেখে জ্বলন্তভাষায় নিন্দে করে বেড়াবেন, সে সুখেরও গোড়া কেটে রেখেছেন নিজেই।

এত অপদস্থ মানুষে হয়? এত অবান্তর, এত গৌণ?

সহসা সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে নববধূরূপিণী ভিজে-বেড়ালটির উপর। বটে, ভেতরে ভেতরে এত? এরই মধ্যেই বরের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে বাসায় যাবার ফিকির করা হচ্ছে?...মা-বাপের জন্যে কি মন কেমনও করে না ছাই?...ছি ছি, ঘেন্নায় লজ্জায় নবতারারই যে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

লজ্জা নেই, সরম নেই, হায়া নেই, ছি ছিঃ! এই সব মেয়েছেলেরা এত কাল বিয়ে না করে ছিল কি করে?

গলায় দড়ি—গলায় দড়ি।...

গলায় দড়ি তো বটেই—কিন্তু কার?

(১৩৫২)

(মূল বানান অপরিবর্তিত)

অ

অন্তরমহল

জীবনখাতা

জন্ম—৮ জানুয়ারি ১৯০৯। মা সরলাসুন্দরী, বাবা হরপ্রসাদ গুপ্ত। ন'টি ভাইবোনের মধ্যে আশাপূর্ণা পঞ্চম।

১৯২২ সালে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় ছাপা হয় প্রথম লেখা 'বাইরের ডাক'। কবিতা, গল্প পাঠাতে উৎসাহ দেন সম্পাদক রাজকুমার চক্রবর্তী।

১৯২৪ সালের জুলাই মাসে গোয়ারি কৃষ্ণনগর নিবাসী কালিদাস গুপ্তর সঙ্গে বিবাহ। 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক', 'টমকাকার কুটির', 'শিশু' ইত্যাদি পুরস্কারের বইগুলি সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল নতুন বউটি। কালিদাস গুপ্ত চাকরি করতেন কলকাতায়। সপ্তাহান্তিক ছুটিতে যেতেন কৃষ্ণনগর। দু'বছর পর, **১৯২৬** সালে, শ্বশুর-শাশুড়ি-সহ সপরিবার কলকাতায় রমেশ মিত্র রোডের বাসায় এলেন আশাপূর্ণা।

১৯২৬-২৯ কন্যা পুষ্পরেণু, বড় ছেলে প্রশান্ত ও কনিষ্ঠ সুশান্তর জন্ম। নানা পত্রপত্রিকায়, বিশেষত 'শিশুসাথী'তে নিয়মিত লেখা হচ্ছিল ছোটদের জন্য গল্প।

১৯৩৪ শুরু হয় বড়দের জন্য গল্প লেখা।

১৯৩৮ প্রথম ছোটদের গল্প সংকলন 'ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা' প্রকাশিত হল, প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরি।

১৯৪০ মায়ের মৃত্যু। বড়দের গল্পের প্রথম সংকলন 'জল আর আগুন'। প্রকাশক দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং।

১৯৪৩ মন্বন্তরের বছর। স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার আগেই কন্যা পুষ্পরেণুর বিয়ে হয়ে গেল বাঁকুড়ায়।

১৯৪৯ দীর্ঘ অসুস্থতার পর বড় ছেলে প্রশান্তর মৃত্যু।

১৯৫৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা পুরস্কার'-এ সম্মানিত।

১৯৫৬ থেকে **১৯৬০** ছোট ছেলে সুশান্তর চাকরি পাওয়া ও বিয়ে। মেয়ের স্কুলের পড়া শেষ হয়নি যখন বিয়ে হয়ে যায়। কোথাও তারজন্য কী কোনও বেদনাবোধ ছিল, যা প্রকাশ পায় পুত্রবধূ নুপুরকে সাগ্রহে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শেষে ইংরেজি সাহিত্যে ডক্টরেট পর্যন্ত করার উৎসাহ দেওয়ায়! বড় করে আনন্দ উৎসব করেন পুত্রবধূর এই ডক্টরেট পাওয়া উপলক্ষে। পঞ্চাশ অতিক্রমের মধ্যে প্রাকৃতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মেয়ে হওয়ার দায় চুকিয়ে, অর্থাৎ বিবাহ, সন্তানজন্ম পারিবারিক কর্তব্যাদি, মেয়ে ও ছেলেকে তাদের নিজের নিজের সংসারে স্থাপন করে দেওয়ার পর, লেখায় অনেক বেশি সময় ও মনোযোগ দিতে পারলেন আশাপূর্ণা।

১৯৫৮ 'গল্প পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম প্রকাশ।

১৯৬০ কালিদাস গুপ্ত ও আশাপূর্ণা উঠে এসেছেন গোলপার্কের সরকারি আবাসনে।

'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশনার কর্ণধার তখনকার খ্যাতনামা সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুকবি নরেন্দ্র দেব-এর সঙ্গে স্বজনসুলভ যোগাযোগের ফলে এই সময় থেকে আশাপূর্ণা ধীরে ধীরে পা রাখছেন ঘরের বাইরে। আশাপূর্ণার গল্পও প্রকাশ পাচ্ছে অনেক জায়গায়। দ্রুত ও নিয়মিত। এই সম্পর্ক রয়ে যায় আজীবন। এমনকী গজেন্দ্রকুমার গত হওয়ার পরও 'মিত্র ও ঘোষ'-ই আশাপূর্ণার প্রধান প্রকাশক।

১৯৬৪ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রকাশ। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এ কটক যাওয়া।

১৯৬৬ রবীন্দ্র পুরস্কার।

১৯৬৭ 'সুবর্ণলতা'।

১৯৭২ দিল্লি থেকে প্রকাশিত হল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র হিন্দি অনুবাদ। অনুবাদক হংসকুমার তেওয়ারি। এর আগেই 'অগ্নিপরীক্ষা', 'দোলনা'র মতো কিছু গল্প হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে।

এ বছরই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের (শিলিগুড়ি) অধিবেশনে আশাপূর্ণা কথাসাহিত্য শাখার সভানেত্রী পদে বৃত।

১৯৭৪ 'বকুল কথা' প্রকাশিত হল। এর মধ্যে কিন্তু চলছে অন্যান্য উপন্যাস, ছোটগল্প রচনা।

১৯৭৬ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। ভারত সরকারের দেওয়া 'পদ্মশ্রী' উপাধি, শিশু সাহিত্য পরিষদের 'ভুবনেশ্বরী' পদক।

১৯৭৮ কালিদাস গুপ্তর মৃত্যু। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবীর কাছে আশাপূর্ণার মন্তব্য 'আমাদের দু'টিতে কিন্তু খুব ভাব। অনেক ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে থেকেছি তো।' সাহিত্য জগতের কাছের মানুষরাও চলে যাচ্ছিলেন—যেমন নরেন্দ্র দেব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। একা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে যাচ্ছিল কানের ক্ষমতা, কিন্তু যথেষ্ট বিশ্লেষণী তখনও তাঁর লেখা।

আটের দশকে ভারতীয় দূরদর্শন তৈরি করছে 'আশাপূর্ণা দেবীর জগৎ।'

দোলনা, ছায়াসূর্য, অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি আশাপূর্ণার অনেক ছোটগল্প নিয়েই জনপ্রিয় ফিল্ম তৈরি হয়।

কথাকার হিসেবে এই সমস্ত সময়টা ধরেই 'রান্নাঘরের লেখিকা' আশাপূর্ণা অসম্ভব জনপ্রিয়।

১৯৮৩ জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট।

১৯৮৭ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট।

১৯৮৮ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট।

১৯৮৯ বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' লাভ।

১৯৯৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রাপ্তি।

১৯৯৪ সাহিত্য আকাদেমির সর্বোচ্চ সম্মান, 'ফেলো' নির্বাচিত হন।

১৯৯৫ মাস দুই রোগে আচ্ছন্ন থাকা, মাত্র মাস দুই লেখনি বন্ধ। তারপর ছেড়ে যাওয়া, ১৩ জুলাই, সাড়ে আট দশকের মেয়েলি লেখার ঝাঁপি রেখে।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

তেষট্টি

টেলিফোনের ওধারে এক মহিলার গলা, হ্যালো।

আমি এপার থেকে, হ্যালো। আচ্ছা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন?

—তুমি কে বলছ?

—আমার নাম...। আমি হালিশহরে থাকি।

—হ্যাঁ, তা ওঁর সঙ্গে কী দরকার?

—না, মানে একটু কথা বলব। উনি আমায় চেনেন।

ওপারে বিস্ময়, চেনেন! আচ্ছা, একটু ধরো তো তুমি।

এবার আমার বুক ঢিপঢিপ। কী হয়, কে জানে। কথা বলবেন তো! নাকি বকুনি। ঘরে ঘোলাটে ষাট ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। ড্যাম্প ধরা ঘরের প্রাচীন দেওয়ালে বিন বিন ঘাম ফুটছে। উঁচু কড়ি-বরগার সিলিং-এর মাঝখান থেকে বড় বড় ডানাওয়ালা ফ্যান ঘুরছে কমানো গতিতে। সাবেক পাঁচটাকা দিয়ে নাকি কেনা দেওয়াল ঘড়িটার বুক থেকে ভারী টকটক শব্দ উঠছে। পেতলের পেণ্ডুলামটা তার পেটের কাছে মেপে মেপে দুলে চলেছে। বাইরের রাস্তায় সাইকেলের ক্রিং। বার বাগানে তুমুল ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। পাশের বাড়ির রবীনদার সেই আজব সারাইঘরের জানলা-বন্ধ ওপার থেকে রেডিও'র গান উড়ে আসছে। হেমন্তবাবু গাইছেন, না এ চাঁদ হোগা না তারে রহেঙ্গে...

অমনি টেলিফোনের ওপার থেকে গম্ভীর গলা, হ্যালো-ও।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি, দাদু, আমি হালিশহর থেকে বলছি...। চিনতে পেরেছেন?

একটুখানি চুপ। তারপর, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তুই তো আমায় চিঠি লিখেছিলি?

—হ্যাঁ দাদু। আপনি কেমন আছেন?

—আমার শরীর ভাল নেই।

—কী হয়েছে?

—বুড়ো মানুষ তো! অনেক ব্যামো রে ভাই।

—ওষুধ খেয়েছেন?

এবার সামান্য হাসি, হ্যাঁ হ্যাঁ। তা বল কী বলবি।

—আপনি কি এখন লিখছেন?

—হ্যাঁ, লিখছিলাম তো।

—দাদু, আপনি কি হাঁসুলিবাঁক বইতে লেখা ওইসব শিস-দেওয়া সাপ দেখেছেন?

—দেখেছি বৈকি। ওদের শিস শুনেছি।

—শুনেছেন!

—হ্যাঁ, তা না হলে লিখব কেমন করে।

—এখন আপনি কী লিখছেন?

—উপন্যাস তো ও বেলা লিখি। এ বেলা যুগান্তরের লেখা।

—গল্প?

—না, না, ওসব আমাদের গ্রাম-দেশের কথাবার্তা। ধারাবাহিকভাবে যুগান্তর-এ বেরচ্ছে।

এবার আমার প্রশ্ন পাল্টায়, আচ্ছা, আপনি রামেশ্বর রায়কে দেখেছেন?

আবার চাপা হাসি, না দেখলে লিখলাম কেমন করে!

—আমার ওই জায়গাটা খুব ভাল লেগেছিল। ওই যে, ওনার স্ত্রী বিকেলবেলা গা ধুয়ে এসে ছাদে বসেছেন। সন্ধে হচ্ছে। দূরে সাঁওতাল পাড়ায় মাদল বাজছে। রামেশ্বর ওনাকে কবি জয়দেব পড়ে শোনাচ্ছে। কী সুন্দর।

—তোর ভাল লেগেছে?

—খুব।

—বেশ, তা হলে এবার ছাড়ি।

—আবার লিখবেন এখন?

—হ্যাঁ, তারপরে পুজোয় বসব।

—এত রাত্তিরে পুজো! কী পুজো দাদু?

—ও সে তুই বুঝবিনে রে পাগলা।

—আমি কিন্তু আপনাকে আবার একদিন ফোন করব।

—বেশ তো।

কথা ফুরোয়। বাইরের ঝিঁ ঝিঁ ডাক আমার চারদিকে ঘোর করে আসে। কড়িকাঠে ঘুনপোকা কিরকির, কিরকির হুল চালাতেই থাকে। ইঁদারাতলায় কে যেন কপিকল খড়খড়ায়। বাবা এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। রোজই প্রায় গভীর রাত হয়। কোথায় কোন কোন দেশে বাবা টেলিফোনের কেবল্ ফল্ট সারাই করিয়ে বেড়ায়। তারপর কোনওরকমে লাস্ট ট্রেন ধরে হালিশহর স্টেশনে নেমে গ্যারেজ থেকে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরবে নিঝুম বুনো পুকুরি রাস্তা বেয়ে।

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। ঘন রাত। পুকুরময় শতেক অলিগলি। ডগডগে মানকচুর পাতে বৃষ্টি টলটল।

পুকুরধারে সর্দার ব্যাঙের গলা, আর সব ব্যাঙ ছ্যাপিয়ে—যেন বাজ কড়কাচ্ছে। পথের পাশে বেশির ভাগই সাবেক কোঠা—তাও গোনাগুনতি। বেশিরভাগই বুনো ঝুপসি বাগান। এমনি এমনি ফেলে রাখা কে বা কাদের জমিতে মানুষপ্রমাণ জঙ্গল। সেইসব জাঙালে কত না লুকোছাপা শাঁখালুর লতা। শাদাটে লতার ডাঁটি দেখলে আমি ঠিক চিনতে পারি। একটা ছোটহাত শাবল দিয়ে খুঁড়ে বড় বড় আলু তুলি। তারপর তাকে পুকুরের জলে বেশ করে ধুয়ে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাই। আর আছে আঁশফল গাছ। গোল গোল কালোজাম ধাঁচের দেখতে। এমনিতে খুব আঁশটে মেছো গন্ধ। কিন্তু খেতে বেশ। ওইসব বাদাড় থেকে কত কুঁচ ফল নিয়ে সেগুলো ভেঙে কৌটোবোঝাই করি। বঁইচি ফল তুলে কোঁচড় ভরি। কুলকুলি তলায় কালো রঙের পুরনো গাছ ঠেঙিয়ে মধুকুলকুলি আম পাড়ি। ছোট্ট ছোট্ট গোল গোল কাঁচা আম। কিন্তু কাঁচায় কী মিঠে। বিনি নুনেই দিব্যি খাই। প্রকাণ্ড চালতা গাছের তল থেকে পাকা হলুদ চালতা কুড়িয়ে তেল-নুন-কাঁচালঙ্কা চটকে মাখি। কী দারুণ খেতে! আর আছে পাকা খেজুর। হলুদ বর্ণ ছেড়ে ঝাড়বোঝাই পাকা খেজুর এখন তামাটে রঙা। কী মিষ্টি খেতে। এইসবের মধ্যে দিয়ে আমার কানু বাবা সাইকেল টলমলিয়ে জোরে জোরে প্যাডেল করছে। পকেট থেকে খয়েরি দ্রব্যভরা বোতলটা হুইইই কোন পুকুরে ফেলল। প্রাচীন কোনও বাড়িতে এক বৃদ্ধ একা বসে রাত জেগে রেডিও সংগীত সম্মেলনে বড়ে গুলামের মালকোষ শুনছেন। ও ঘরে ডিম লাইট জ্বলছে। বাবা জোরে মোড় ঘুরল। তারপরই ঝমঝমিয়ে জল নামল। বাবা বাড়ির সামনে সাইকেল বাইতে বাইতে এসে লম্বা হাঁক দিল আমার ছোটবোন সোমার উদ্দেশ্যে, মা আ আ আ আ...

আমি এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে মনে মনে কাকে যেন বলে চলেছিলাম, বাবাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দাও...ফিরিয়ে দাও। মা জানলার ধাপে অন্ধকারে একা বসে। ও ঘরে বড়মার হাই-অ্যা-অ্যা-অ্যা। দাদুর শ্বাসকাশি। মা নেমে যায়। অন্ধকারে।

আমিও চুপি চুপি। বাইরের ঘরে তক্তপোশে বাবা জামাপ্যান্ট-সহ চিৎপাত। সারা গায়ে মাথায় কাদা। হয়তো দু-একবার পড়ে গিয়েছে।

মা হেঁট হয়ে বাবার পা থেকে ভিজে জাব জুতো খোলে। মোজা টেনে নিঙড়োয়। বাবা সুরেলা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে গায়, তাজমহলের মর্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল...শুভ্র মেঘের দল...

বাবার সবই হয়। কেবল শচীনকর্তার উচ্চারণটা বাদ পড়ে যায়।

রামপ্রসাদ যখন বিদ্যাসুন্দর চাইছেন আপন নিবিষ্ট মনে তখন গঙ্গার তরঙ্গ বয়ে আনছে রাজারাজড়া আর সাহেবি-সমাচার। সে-সমাচারের কেন্দ্রে এখন রবার্ট ক্লাইভ নামে প্রাক্তন কেরানি থেকে উঁচুতে-ওঠা এক জেদি ব্যক্তি।

এই ক্লাইভ মেজর কিলপ্যাটরিক ও দলবল সমেত

বজবজে এসেছে। ক্লাইভ লোকটি যতখানি না যোদ্ধা তার চেয়ে অধিক উচ্চাভিলাষী। মনে মনে এবং প্রকাশ্যে তাঁর গর্বিত ঘোষণা আছে, শুধু কলিকাতা পুনরুদ্ধার নয়, কোম্পানির জন্য এমন এক পাকা ব্যবস্থা তিনি করতে চান, যা আগের চেয়ে **শুধু** ভালই হবে না, আগে যা কখনও হয়নি এবার তা**ই হবে**। তাঁর আরও ধারণা, সিরাজ একজন অতি **দুর্বল** নবাব। দরবারের খাস ব্যক্তিরা নবাবের প্রতি খুবই বিরূপ।

ক্লাইভ এ বাংলার সঙ্গে অপরিচিত নন মোটেই। ১৭৪৯-'৫০ সালের শীত ঋতুতে তিনি কলিকাতায় এসেছিলেন। তখনই এই আদপে বানিয়ার মনে দাগ রেখেছিল বাংলার বিপুল ঐশ্বর্যের খনি। বানিয়া ইংরাজ আর তার রক্তজাত এই ক্লাইভ প্রধানত ব্যবসার লাভ-ক্ষতি নিয়েই ভাবিত। আর এই সূত্রেই দূর হতে মাদ্রাজ কাউন্সিল তাঁকে নির্দেশ জারি করেছে, মসির সঙ্গে অসিও ব্যবহার করতে হবে। নবাবের দিকে অবিলম্বে আক্রমণ শানাতে হবে। নবাবকে এমনভাবে ধ্বস্ত করতে হবে যাতে করে তিনি ইংরাজদের ব্যবসাবাণিজ্যে আক্রমণ করতে সাহস পাবেন না।

বজবজে ক্লাইভের লীলা অনন্য। তাঁর পরে পরেই ওয়াটসন সাহেব এসে উপনীত জাহাজপত্র সমেত। তখনও দুই মিতে একে অপরের মুখ দেখেননি। ক্লাইভের আক্রমণ লক্ষ্য মানিকচাঁদ। মানিকচাঁদ মনে মনে ক্লাইভ ও তাঁর বাহিনীকে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেন। এদিকে ক্লাইভ তাঁর বাছাই সেনা নিয়ে যখন গঙ্গা বরাবর মানিকচাঁদকে ধাওয়া করলেন, তখন মানিক তাঁর দু'হাজার সেনা নিয়ে প্রতি আক্রমণ করলেন। কিন্তু ইংরাজের গোলা তীরবেগে ধেয়ে এসে তাঁর মস্তকের পাগড়ি উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তিনি পলায়ন করলেন। সন্ধের পর নবাবি ফৌজ সব চম্পট দিলে। বজবজ কেল্লাকতক বিনি যুদ্ধেই ইংরাজদের হাতে এসে গেল।

ক্লাইভ তো ক্ষান্ত দিতে আসেননি। তিনি এবার পথ ধরলেন কলিকাতার। যাওয়ার আগে বজবজের কেল্লাটি ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিলেন—পাছে আর নবাবি সেনারা সেখানে ফিরে এসে ঘোঁট না পাকাতে পারে।

জলপথে চলতে চলতে গঙ্গার একধারে পড়ল মেটেবুরুজের মাটির কেল্লা, যে-স্থানের নাম আলিগড়। আর ওধারে শিবপুরের থানা দুর্গ। ইংরাজের ভয়ে কেল্লাজোড়া এমনি এমনিই ফাঁকা হয়ে গেল। ক্লাইভ তাঁর সেনাপত্র নিয়ে নেমে পড়লেন মেটেবুরুজে। ওয়াটসনও জাহাজ নিয়ে এগোলেন। মেটেবুরুজ হতে ক্লাইভ কলকাতার দিকে অগ্রসর হলেন।

অগ্রসর হলেন, আর অধিকারও করে নিলেন কলিকাতা। সবই যেন চোখের পলকে ঘটে যেতে লাগল। কলিকাতা নগরি যেন প্রেতপুরী এখন। অমন স্বর্ণখচিত নগর এখন হীন, ছন্ন। সেই প্রায়-শ্মশানে বসে ক্লাইভ নবাবের দিকে যুদ্ধ হেঁকে বসলেন। তিনি ঠাঁই নিলেন বরাহনগর প্রান্তরে তাঁবু গেড়ে। এই স্থান জলা-জংলা। দিবসেতেও বুনোবরাহ ধাওয়া করে।

ক্লাইভ এখানে বসেই হুগলির ডাচদের দমন করার *যুক্তি আঁটলেন। কেননা ওটিও এক ক্ষুদ্র কণ্টক। ওয়াটসন* আর ক্লাইভ দুই তরফে ঘুঁটি সাজালেন। খবর গেল হুগলিতে। সেখানে কান্নার ধুম পড়ে গেল। ইংরাজি

জাহাজ হুগলি দুর্গের সুমুখে এসে থামল। নেমে এল গোরা সৈন্যর দল। ওধারে জাহাজ হতে নাগাড়ে গোলাবর্ষণ চলল দুর্গের দিকে। মাঝরাতের পর দুর্গ দখল করল ইংরাজ। ইতিমধ্যে নবাবের হাজার দুই সেনা, যারা এই দুর্গ পাহারা দিয়েছিল, পলায়ন করেছে। ইংরাজরা হুগলি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খার করল। ঘরবাড়ি একটিও আর টিকে রইল না।

এধারে নবাব সিরাজও বসে নেই। তিনি ইতিমধ্যে লোকলস্কর-সহ উপনীত হয়েছেন ত্রিবেণীতে। তাঁর সঙ্গী চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ার, ষাট হাজার পায়ে-চলা সেনা, পঞ্চাশটি হাতি আর ত্রিশটি কামান। এ খপরে ইংরাজরা কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে পড়লে। কেননা নবাবের বাহিনী তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক ভারী। বাজারে খপর, নবাব কলকাতা যাবেন। কিন্তু মাঝপথে বরাহনগর, যেকালে ক্লাইভ বসে, তাই তাঁর সেনা যাওয়ার পথ হল বারাসতের এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে, দমদমা হয়ে কলকাতা।

তার আগের দিন বিকেলবেলা নবাব বজরা সাজিয়ে *গঙ্গায় নামলেন খানিক দূর দেখে কিংবা বেড়িয়ে আসতে।* কে জানে, এমনও তো হতে পারে সেনাদি যাবে স্থলে আর তিনি যাবেন জলে।

সারাটি দিনমান বিদ্যাসুন্দর রগড়ে রামপ্রসাদ এসেছেন সান্ধ্য গঙ্গাস্নানে। এমনটি নিত্যি ঘটে না। যেদিন শরীর উত্তপ্ত হয়, সেদিনই গঙ্গা তাঁকে টেনে আনে নিজ ক্রোড়ে। স্নানও হয় আর টাটকা-টাটকি দেশের খপরপত্রও কিছু জোটে। আজ প্রসাদ একাই গঙ্গায় এসেছেন। ভজহরিকে ঘরেই রেখে এসেছেন।

নিজেকে জুড়াবার জন্য যেমন এই গঙ্গা তেমনই অন্তরকে শীতল করার উপায় শুধুমাত্র নিজ গীতে। তাই প্রসাদ আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে দু'হাত ঊর্ধে তুলে গীত রচেন।

ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত।।
আমি ভাবি এক, হয় আর,
সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায়,
এ দেহের পঞ্চভুত।।

সন্ধ্যার আঁধারে যে-বজরাটি ত্রিবেণীর দিক হতে ধীর লয়ে বয়ে আসছিল, সেটি এবার থমকে থেমে যায়। থামে প্রসাদী গীতের থেকে খানিক তফাতে। অন্ধকার কালো স্রোতে সেই গম্ভীর বজরা আস্তে আস্তে নোঙর গাড়ে।

প্রসাদ প্রথম চরণখানি আবার ফিরে গান।...তারা বল খাটাবি কত...।

বজরায় মৃদু আলো জ্বলে। আলোর একটি দীঘল শিখা বজরার ক্ষুদ্র জানলা গলে বাইরে এসে নামে। নেমে যায় গঙ্গার স্রোত বরাবর। এ অন্ধকারে সেই আলোর বহর জলের বুকে তীর কী বল্লম তার হিসেব কষবার জো রয় না এই নিঃসীম চরাচবে। আলোর গতি মোতাবেক সে চিরকালই অন্ধকারের বিবাদী। সেই বিবাদ-ঝগড়ার অন্তরালে কোনখানে একপল বোঝাপড়ার অতীত ভালবাসা গুপ্ত হয়ে রয়, তার আঁক-কষা জীবজগতের সাধ্যে নেই। এমনকী নিঃস্বার্থ গাছপালা লতাপাতাও নাচার।

রামপ্রসাদ আপনার মনে আপনার গীতখানির বীজ বপন ও ফলন ঘটান। নিজ সৃজনের ফল নিজেই আস্বাদন করেন। আপনার মধ্যে বুঝি আপনাকে ঢুঁড়ে বেড়ানোর এ এক অচিন খেলা। প্রসাদ নিজের রচিত পদে নিজেই অবাক বলেন, আমি ভাবি এক, হয় আর...

বজরার ছায়া ছায়া আর কিঞ্চিৎ আলোমাখা বৃহৎ অবয়ব থেকে একটি ক্ষুদ্র আকার ভূমিষ্ঠ হয় স্রোতের বুকে। সেই পলকা ডিঙাখানি ভেসে পড়ে জলে।

এধারে সিরাজের পায়ে-চলা বাহিনীও বসে নেই। তারা জোরকদমে এসে পৌঁছেছে উমিচাঁদের

হালসিবাগানের অট্টালিকার বড়োসড়ো বাগানে। সেখানে তাদের ছাউনি পত্তন হয়েছে। আর সেখানেই ইংরাজের একজোড়া দূত এসে উপনীত হয়েছে। তাদের বচনে শান্তির কথা আর মনে মনে নবাবের ফৌজিবহরের খবরতালাশ করা। ক্লাইভ বানিয়ার মনের ভিতরে একটিই তত্ত্ব—নবাবটিকে যদি একবার যে কোনওমতে কবজা করা যায়।

রোগা-পাতলা ডিঙাটি ধীরে এসে ভেড়ে আঘাটার পাশে। তার ভিতর থেকে একজন মাথায় পাগড়ি রোগাসোগা ব্যক্তি লাফ দিয়ে তীরে নামে। লোকটি নামামাত্র জোড়হস্ত। রামপ্রসাদ ব্যাপার-বিষয় দেখে কিঞ্চিৎ অবাক। কে এই লোক এমত মনাবস্থাতে তিনি ডুব দেওয়া সেরে ঘাটে ওঠেন। গামছা দিয়ে বেশ করে গা-মাথা মুছতে থাকেন। আকাশের এক কোণে, বহু দূরে সদ্য লণ্ডভণ্ড হুগলির কালো আকাশপটে পোড়া দগ্ধ অঙ্গার লেখা। সেই আগুনপোড়া লিখন বুঝি দেশকালের দীর্ঘশ্বাসকে খানিকটা অন্তত এঁকে দিয়ে বসে আছে।

লোকটি পায়ে পায়ে রামপ্রসাদের দিকে এগিয়ে এল। তারপর সেই একই হস্তজোড় গতিকে মাটির দিকে যথাসাধ্য অবনত হয়ে বলে ওঠে, ঠাকুর, একটি নিবেদন ছিল।

প্রসাদ ভ্রু কুঁচকে তাকান একবার। মনে মনে লোকটিকে জরিপ করেন।

সে এবার বলে, নবাব আমায় বলে পাঠিয়েছেন—যদি কিরপা করে একটিবার তাঁর বজরায় উঠতে আজ্ঞা হন।

প্রসাদ অবাক কন, নবাব! মানে!

—আজ্ঞে বঙ্গেশ্বর নবাব সিরাজুদ্দৌলা স্বয়ং আপনার সাক্ষেৎ প্রার্থনা করছেন মহাশয়।

প্রসাদ আবারও কন, নবাব! কোথায়?

সে পাশ ফিরে অতি বিনীত অবস্থায় গঙ্গায় নোঙর করা বজরাকে ইঙ্গিতে দেখায়। দেখায় আর চোখে যথাসম্ভব প্রার্থনার বিনতি বইয়ে চলে।

প্রসাদ একপল ভাবেন। তারপর বলে ওঠেন, চলো দেখি।

সামান্য সময়ের মধ্যেই ছোট তরী এসে ছোঁয় নবাবী বজরাকে। লোকটি আগে উঠে পড়ে তড়াক দিয়ে। তারপর একটি ক্ষুদ্র সিঁড়ি নীচে নামিয়ে দেয়। প্রসাদ সেটি বেয়ে ওপরে উঠে যান।

দোতলার বিরামঘরে ধূপ জ্বলছে চন্দনগন্ধী। আর উড়ছে আতরের খোশবাই। ঘর বললে ভুল হবে। এটি প্রকৃতপক্ষে মস্ত মস্ত জানালা-আঁটা বারান্দা সমান। বিদেশি পুরু কাচের ওপারে বাতি জ্বলছে। তার ওধারে দণ্ডায়মান যুবক যে বঙ্গাধিপ, তা বিশ্বাস করতে বিলম্ব হয় না প্রসাদের। সেই যুবকের মুখমণ্ডল ভারি লাবণ্যময়। সাজানো ভ্রু'র নীচে একজোড়া টানা টানা আর কতক বিহ্বল কুতুহলি চক্ষু। পরনে মখমলের সফেদ জোব্বা আর মাথায় একপাগড়ি ধাঁচের টুপি। তাতে কিছু মানিকপত্র গাঁথা। বাম কাঁধ থেকে বুকের ওপর আড়াআড়ি নেমে আসা খয়েরিরঙা উত্তরীয়টি কোমরে বাঁধা পুরু বস্ত্রবন্ধের সঙ্গে এসে মিশেছে। গলায় একটি তিননরি হার। যুবকের নাসিকাভঙ্গি বাজতীক্ষ্ণ। আর ঠিক তার নীচে চমৎকার করে ছাঁটা আর নেমে যাওয়া দু-টুকরো বিরহি গোঁফের বাহার। পাতলা কোমল অভিমানী ঠোঁটজোড়া স্মিত হাসিমাখা। নবাবের আদবি জোড়হস্ত দেখতে দেখতে প্রসাদ ভাবেন—কী কোমল ওই আঙুলগুলো। এ হাতে তরবারি ও রক্তধারা কেমন করে মানিয়ে যায়।

—আপ তসরিফ রাখিয়ে জি।

নবাবের শান্ত অনুরোধ। রামপ্রসাদ বজরার পাটায় বিছানো নরম গালিচায় দু'পা মুড়ে বসেন। বসেন নবাবও, অপর প্রান্তে, সবিনয়ে আর মহা কুতুহলি মুখ সাজিয়ে। তারপর আধা খেঁচড়া ভাষায় বলে ওঠেন, এক গীত শুনাইয়ে জি। বহুত মধুর আপনার গানা।

প্রসাদ সামান্য হাসেন। তারপর বলেন, আমার গান আপনার পছন্দ হল কেমন করে!

নবাব হাসেন, সুর, আপকো সুর বহুত মিঠা। বহুত উমদা।

প্রসাদ এবার ধন্যবাদসূচক কুর্নিশ জানান প্রশংসার জবাবে। তারপর মনে মনে গান খোঁজেন। কেন না তিনি জানেন, এই নবাব তাঁর রচিত খাসগীত, যা বাংলা ভাষায় বাঁধা, যথাযথ সমঝে উঠতে পারবেন না। অতএব পুরনো শিক্ষা মোতাবেক বিভাষী গীত।

গঙ্গার স্রোতে সন্ধ্যা আরও গড়িয়ে বা ঘনিয়ে ওঠে। দূরে-কাছে কয়েকটি সশস্ত্র নৌকা নবাবি বজরাখানি পাহারা দিয়ে চলে। এই অন্ধকারে তাদের বন্দুকের সঙ্গীনগুলি ঝকঝক করে। ঝিকিমিকি চঞ্চল দেখায় প্রহরায় থাকা মানুষের চক্ষুশলাকা। ওপার থেকে দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতির শাঁখ-ঘণ্টা ভেসে আসে। রামপ্রসাদ বাম কানে হাত চাপা দিয়ে গান ধরেন, ও জালিম, প্যারে জালিম, আজ মুঝে খালাস দো তুমহারা মহব্বতি আগ সে—

সান্ধ্য পুরবীতে বাঁধা এই গজল শুরু হওয়ামাত্র নবাবের তরফ থেকে মৃদু বাধা। প্রসাদ দেখেন বঙ্গেশ্বর একটি হাতে বারণ এঁকে ওপরে তুলে ধরেছেন।

প্রসাদ অবাক তাকিয়ে প্রসঙ্গ বুঝতে চান। তার আগেই নবাব বলে ওঠেন, ও গানা নেহি। যো আপ-আপ, যে গানা গাইছিলেন কুছ পহিলে, ও গীত। ওহি শুনাইয়ে।

মুহূর্তে প্রসাদ পরিস্থিতি বুঝে ফেলেন। তিনি ধরতে পারেন তাঁর রচিত যে-গীত আপামরের কাছে হাটখোলা আর অপার আদরের, তা ওই ভিনমার্গী বাংলার নবাবকেও ছুঁয়ে দিয়েছে। মনে মনে চোখে জল আসে প্রসাদের। জগন্মাতার কাব্যকলার কী বিচিত্র স্বভাব। অতএব ফেলে আসা গীতেই তিনি ফিরে যান।

ও মা ষড়রিপু সাহায্যে তায়,
হোলো ভূতের অনুগত।
আসিয়া ভবসংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত।।
যার সুখেতে হব সুখী,
সে মন নয় গো মনের মতো।।
চিনি বলে নিম খাওয়ালে,
ঘুচলো নাকো মুখের তিত।
কেন ভিষক্ প্রসাদ মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত।।

(চলবে)

ছবি শান্তনু দে

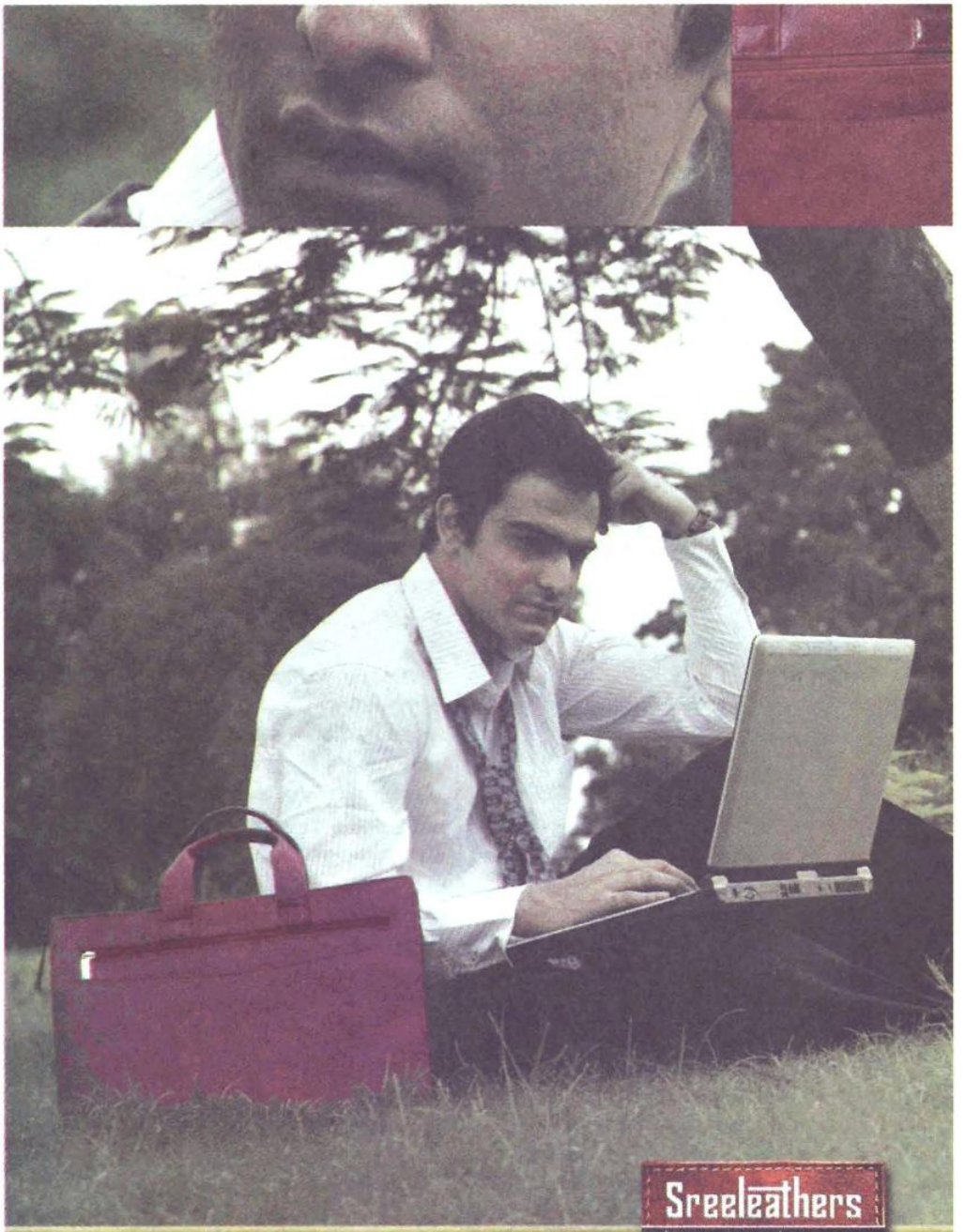

Sreeleathers
bags and more

27801 Rs 1188

GET AWAY.

LADIES BAGS | CLUTCHES | PURSES | MAKEUP BOXES | JEWELLERY BOXES | TOILET BAGS | SHOPPING BAGS | TRAVEL BAGS
STROLLEY BAGS | SCHOOL BAGS | SPORTS BAGS | WAIST POUCHES | BELTS | WALLETS | BRIEFCASES | PORTFOLIOS... Rs 19 ~ Rs 4319

DELHI | KOLKATA | LINDSAY STREET ~ 2286 1511 | FREE SCHOOL STREET ~ 2286 1506 | COLLEGE STREET MARQUIS SQUARE ~ 2219 7984
BEHALA MARKET ~ 2468 1341 | GARIA BASU MARKET ~ 2430 3076 | HOWRAH | CORPORATION STADIUM COMPLEX ~ 2641 0608 | DOMJUR | NAIHATI
BARDDHAMAN | DURGAPUR | ASANSOL | BERHAMPUR | PURULIA | JAMSHEDPUR | DHANBAD | RANCHI | BOKARO | HAZARIBAG
BHAGALPUR | MUZAFFARPUR | PATNA | CUTTACK | BHUBANESWAR | AGARTALA | VARANASI | RAIPUR | GUWAHATI

ResponseIndia.Com

রো
রোববারের
মেগা

ঝিলডাঙার কন্যা

প্রচেত গুপ্ত

ফুলকে নিয়ে নিতাই আর মালতি গোপীনাথ ডাক্তারের কাছে যায়। তিনি বলেন ভয়ের কিছু নেই। পরদিন দুপুরে দাওয়ায় বসে মাথা নামিয়ে পিঁপড়ের চলন দেখছিল ফুল। মালতির চিৎকারে সে চোখ তুলে তাকায়। তাকিয়ে বলে বেড়ার ওপারের গাছটা ভেঙে পড়বে। মালতি খুব মারে ফুলকে। সন্ধের মুখে সত্যি সত্যি গাছটি মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

চব্বিশ

কথাকলি পুরোপুরি চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাতে পারে। কিন্তু সে তা করছে না। সে তাকাচ্ছে আড়চোখে।

এ ঘরে আসার কারণে কথাকলি আয়নায় দেখেছে তার চোখের তলাগুলো ফুলে আছে। চোখ ফুলে থাকলে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু ফুলে থাকার কারণ ধরা পড়লে অসুবিধে। সে যে কালও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল, সেটা ধরা পড়ে যাবে। সামনের চেয়ারে বসা মানুষটা শুধু ডাক্তার হলে চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু মানুষটা তার বাবাও। ডাক্তার পারে না, কিন্তু বাবা মুখ দেখে মেয়ের সব খবর জানতে পেরে যায়।

এই কারণেই কথাকলি সুদর্শন রায়ের দিকে পুরো মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। কিন্তু তাকাতে তাকে হবে। চোখ নামিয়ে ঝগড়া করা যায় না। কথাকলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ সে তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করবে। ঠিক ঝগড়া নয়, একতরফা বকাবকি করবে। গম্ভীর গলায় বলল, 'বাবা, তুমি নাকি ঠিক করেছ আবার বানেরহাটে যাবে?'

সুদর্শন রায় বসে আছেন তার হেলানো চেয়ারে। চেয়ার শুধু হেলানো নয়, অল্প অল্প দোলানোও যায়। তিনি অবশ্য চেয়ার দোলাচ্ছেন না। তার গায়ে একটা পাতলা চাদর। হাতে একটা বই। তিনি আগ্রহ সহকারে বই পড়ছেন। কথাকলি বইয়ের নাম দেখতে পাচ্ছে না। খবরের কাগজে মলাট দেওয়া। মলাটে সানিয়া মির্জার ছবি। ছবিটা আড়াআড়িভাবে পড়েছে। মনে হচ্ছে, সানিয়া হাতে টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে শুয়ে আছে। বই পড়ার কারণে সুদর্শন রায় মেয়ের কথা শুনতে পেলেন না।

কথাকলির সামান্য গলা তুলে বলল, 'কী হল বাবা? চুপ করে আছ কেন?'

ডাক্তার রায় এবারও চুপ করে রইলেন। কথাকলির রাগ বাড়ল। তার মনে হচ্ছে, এটা আসলে মানুষটার চালাকি। ঠিকই কথা শুনছে, কিন্তু কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না। দু'দিন আগেই যে কথা দিয়েছিল, বানেরহাটের ক্লিনিকে আর যাবে না, সে-ই যদি হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত বদল করে তা হলে তার চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কী? সবে জ্বর থেকে উঠছে। এই শরীরে যদি ফের অতদূর যাতায়াত শুরু করে তা হলে এবার যে অনেক বেশি কঠিন অসুখে পড়তে হবে তা কি বুড়ো মানুষটা বুঝতে পারছে না?

কথাকলির ইচ্ছে করল উঠে গিয়ে বাবার হাত থেকে বইটা টেনে নেয়। তারপর জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিচে ফেলে দেয়।

'বাবা'।

ডাক্তার রায় এবার সাড়া দিলেন। মুখ তুলে সুন্দর হেসে বললে, 'বল। এক কাপ কফি দিবি মা?'

কথাকলি এবার রাগি গলায় বলল, 'না, দেব না।'

ডাক্তার রায় মেয়ের দিকে হাত তুলে অনুরোধের ঢঙে বললেন, 'বেশি নয় এই একটুখানি। হাফ কাপ।'

'হাফ, ফুল কিছুই হবে না। বাবা, তুমি কি সত্যিই আবার বানেরহাট যাচ্ছো?'

'তোকে কে বলল?' মিটিমিটি হাসি নিয়ে বললেন সুদর্শন রায়।

'যে-ই বলুক। কথাটা সত্যি কি না বলো।'

কথাকলি কঠিন গলাতে যেন কৈফিয়ত চাইল। সে ঠিকই করে এসেছে, কঠিন হবে। মা মারা যাওয়ার পর থেকে এই মানুষটা কঠিন শাসন পায়নি বলেই এতটা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

'নিশ্চয় সুমঙ্গলা এন জিও থেকে রঞ্জন ফোন করেছিল। তাই না কলি?'

কথাকলি চুপ করে রইল। ঘটনা তাই। ডাক্তার রায় অস্বস্তি ভরা গলায় বলল, 'এই রে, একেবারে ধরবি তো ধর তুই-ই ফোনটা ধরলি?'

'তুমি বাথরুমে ছিলে।'

'ঠিক আছে। তা বলে রঞ্জন তোকে খবরটা ফাঁস করে দেবে? হা হা।'

বানানো হাসি দিয়ে মেয়েকে সামাল দিতে চেষ্টা

করলেন সুদর্শনবাবু। কাজ মোটেও হল না। কথাকলি গলা আরও থমথমে করে বলল, 'এটা হাসির কোনও বিষয় নয় বাবা। রঞ্জনকাকাকে কাল রাতে তুমি নিজে ফোন করেছিলে। রঞ্জনকাকা তোমায় বলেছিল, বানেরহাটের ক্লিনিকে তোমায় আর যেতে হবে না। একজন অলটারনেটিভ সাইকায়াট্রিস্টের ব্যবস্থা তারা করে ফেলেছে। তিনিই এবার থেকে দেখবেন। তুমি তখন বলেছ, তুমি নাকি আরও কিছুদিন ওখানে যেতে চাও। ওরা তার পরেও আপত্তি করে। বলে, তোমার শরীরে ধকল হচ্ছে, অনেকদিন টেনেছ, আর দরকার নেই। তুমি তখন জোর করেছ। এই ঘটনা কি সত্যি?'

সুদর্শন রায় মুচকি হেসে বললেন, 'বাপরে বকুনির চোটে কেঁদে না ফেলি। না, ঘটনা পুরো সত্যি নয় কলি। আমি বানেরহাটে আরও কয়েকদিন যেতে চেয়েছি ঠিকই, তবে পাকাপাকি নয়। চেয়েছি একটা বিশেষ কারণে। সেই বিশেষ কারণটার সমাধান হয়ে গেলেই আমার সেখানে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন থাকবে না।'

'বিশেষ কারণটা আমি জানি।'

'জানিস তো, বকাঝকা শুরু করেছিস কেন?'

ডাক্তার রায় হাতের বই ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখলেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আকাশে ঝকঝক করছে রোদ। এই রোদ দেখলে কে বলবে কাল রাতে অমন দুর্যোগ হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির এটাই মজা। নিজেকে দুম করে বদলে ফেলতে জানে।

সুদর্শন রায় মুখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন।

'তোর চোখ মুখের এই অবস্থা কেন কলি? এনিথিং রং? শরীর টরীর খারাপ নাকি? রাতে ঘুম হয়নি?'

কথাকলি তাড়াতাড়ি চোখ নামাল। বলল, 'অমন একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়লে ঘুমের ডিস্টার্ব হবে না? সঙ্গে বাজ পড়ছিল। আমি তো ভেবেছিলাম, বৃষ্টি থামবেই না।

যাক ওসব বাদ দাও, তুমি আমার কথা বলে আলোচনার আসল জায়গাটা থেকে সরে যেতে চাইছ। বিশেষ কারণ হোক, আর যাই হোক শরীরের এই অবস্থা নিয়ে অতদূর যাওয়াটা যে তোমার ঠিক নয়, সেটা কি তুমি জানো না বাবা? নাকি জানার পরও যাচ্ছ?'

মেয়ের চোখ মুখ ফোলার কারণ শুনে মনে হল না ডাক্তার রায় সন্তুষ্ট হলেন। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'না গিয়ে আমার উপায় নেই কলি। আমাকে যেতেই হবে। সেরকম হলে আমি আজই যেতাম।'

কথাকলি চোখ বড় বড় করে বলল, 'আজই যেতে! বাবা কিছু মনে কোরো না, আমার মনে হয় মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে করতে তোমার নিজেরই কোনও সমস্যা হচ্ছে। কাল ওরকম ঝড়বৃষ্টি হল। পথের কী অবস্থা হয়েছে বুঝতে পারছ না? নিশ্চয় ট্রেনের তার টার ছিঁড়ে গিয়েছে। গাড়ি নিয়ে গেলেও সমস্যা। জল কাদা, গর্ত।'

ডাক্তার রায় নিজের মনে মনেই যেন বললেন, 'ঝড়বৃষ্টি হল বলেই আরও যেতে হবে রে কলি। কাল পর্যন্ত চিন্তায় ছিলাম।'

কথাকলি অবাক হয়ে বলল, 'কী নিয়ে চিন্তা? ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে না বলে?'

'ঠিক বলেছিস। গোপালের মা দেশে যাওয়ার আগে বলে গেল, বৃষ্টি আসছে। খুব বৃষ্টি আসছে। কিন্তু কোথায় বৃষ্টি! রোজই নজর রাখি। দেখি, আকাশ একেবারে ফটফটে নীল! শুনলে তুই হাসবি, রাতে ঘুম ভেঙে উঠে আমি মেঘের সন্ধ্যানে ছাদে পর্যন্ত গিয়েছি। দেখেছি, আকাশে মেঘ জমল কিনা।'

কথাকলি গম্ভীর গলায় বলল, 'এখন বুঝতে পারছি, আবার কেন তোমার জ্বর এল। এক তো বানেরহাটে সেদিন যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। তার ওপর আজকাল মাঝরাতে তুমি খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের মেঘ দেখা শুরু করেছ। বাবা, আমি জানি কেন তুমি এসব শুরু করেছ। ওই ফুল না পাতা নামের মেয়েটার জন্য তো? তুমি কি মনে করছ না একজন পেশেন্টের জন্য এটা অতিরিক্ত রকম বাড়াবাড়ি হচ্ছে? গ্রামের সকলেই ছোটখাটো ঝড়বৃষ্টির কথা আগাম বলতে পারে। চাষিরা তো আকাশের দিকে তাকিয়েই বলে দেয় শুনেছি। আমরাও বলি। আমরা যারা শহরে থাকি তারাও প্যাচপেচে গরম দেখে বুঝতে পারি বিকেলে বৃষ্টি হবে। পারি না?'

জ্বর থাকার কারণে দু'দিন দাড়ি কাটা হয়নি। গালে অল্প সাদা দাড়ি ডাক্তার রায়ের। মুখের সৌম্য ভাবটা আরও ফুটে বেরিয়েছে। তিনি থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'ওইটুকু একটা মেয়ের পক্ষে এটাও অসম্ভব। এর জন্য অভিজ্ঞতা দরকার। তাও যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই, শুধু ঝড়বৃষ্টি হলে একটা কথা ছিল। কিন্তু আগুন?'

'আগুন! কই তুমি তো আমাকে আগুনের গল্পটা বলোনি।' কথাকলির গলায় বিস্ময়।

ডাক্তার রায় শান্ত গলায় বললেন, 'কাল যদি বৃষ্টিটা না হত, তা হলে আমি ওই মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য এভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠতাম না রে কলি। প্রথমে যা ভেবেছিলাম, সেটাই ধরে নিতাম।'

ঘটনাটার মধ্যে কথাকলি নিজেও যেন ঢুকে পড়েছে। সে বলল, 'তুমি যেদিন গল্পটা প্রথম আমাকে বলো সেটা তো অন্যরকম ছিল।'

'সত্যি কথা বলতে কী, প্রথম যখন আমি ব্যাপারটা শুনি তখন আমার মনে হয়, মেয়েটার কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা ওর গার্জেনের। বাবা-মা'র। এখন আমার মনে হচ্ছে, ওটা ভুল হয়েছে। ভুল ডায়াগনসিস। ফার্স্ট রিঅ্যাকশনে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি। ভেবেছিলাম, ছেলেমানুষ কখন কী বলছে ঠিক নেই। কোইন্সিডেন্সের মতো মিলে গেলে বাবা-মা ভাবছে, আরে! মেয়ে আগেই কথাটা বলেছিল না! আসলে গ্রামের লোকের মনে নানারকম কুসংস্কার থাকে। ছোট বিষয়কে বড় করে দেখে। আবার বড় জিনিসকে গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু পরে কেসটা আমার মাথার ভেতরে যত ঘুরতে থাকে তত সন্দেহ বাড়ে। কেসটার আরও কতগুলো দিক আছে। কই মেয়েটা তো অন্য কিছুর কথা বলছে না? শুধু বিপদের কথা বলছে কেন? বইয়ের ভাষায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা। জলে ভাসবে, ঝড়ে ভাঙবে, আগুনে পুড়ে যাবে—এইসব আশঙ্কা, ভয়। কথাটা মাথায় আসতেই খটকাটা শুরু হয়। কেন এরকম বলে? কেন ভয় দেখায়? কাকে ভয় দেখায়? বাবা-মাকে? নাকি সবাইকে?'

কথাকলি সামনের সোফায় বসে পড়েছে। বলে, 'ওইটুকু মেয়ে কি আর অতকিছু ভেবেচিন্তে বলছে? হয়তো ভয় দেখাচ্ছে।'

সুদর্শন রায় ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ভয় দেখানোটা যে একটা বিরাট ব্যাপার এরকম বলতে চাইছি না। কোনও কোনও মনোরোগের এটাও একটা লক্ষণ। কিন্তু ঘটনা পরপর সাজানোর পর একসময় আমার মনে হতে থাকল, ফুল নামের মেয়েটা হয়তো বিশেষ কোনও ধরনের স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে। সঙ্গে পারসোন্যালিটি ডিসঅর্ডার। এই যে মেয়েটা ওয়েদার ফোরকাস্ট করে সেটা আসলে ফোরকাস্ট নয়। মনের ভেতরে ঘটা একধরনের পারস্পরিক অন্তঃক্রিয়া আর বিপন্নতার প্রকাশ মাত্র। এটা আবহাওয়ার কথা না হয়ে অন্যকিছুও হতে পারত।'

'বাপরে, সেটা আবার কীরকম?'

সুদর্শন রায় চেয়ারে হেলান দিলেন।

'ও বিপদ বলতে ঝড়বৃষ্টি জানে তাই ঝড়বৃষ্টি বলছে। যদি নিউক্লিয়ার ওয়্যার জানত তাই বলত। ছেলেমেয়েরা আনঅ্যাটেন্ডেড হলে এরকম হতে পারে। অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য এসব বলে। ভাবনার একটা পর্যায়ে এসে আমার মনে হয়েছিল অসুখ বোধহয় তাই, তাই সামান্য। বৃষ্টি হবে, ঝড় হবে, আগুন লাগবে কথাগুলো শুধুমাত্র কথার কথা। গার্জেনদের অ্যাটেনশন পাওয়ার চেষ্টা। আর সেই চেষ্টাই এক সময় অসুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথা বলতে হবে মেয়ের মায়ের সঙ্গে। শি ইজ প্রেগন্যান্ট।'

'তাতে কী হয়েছে? মায়ের বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে মেয়ের অসুখের কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক অবশ্যই আছে। শরীরে নেই, মনে আছে। হয়তো যে শিশুটি আসছে তার জন্য ফুলের মা অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন হয়ে পড়েছে। ফার্স্ট চাইল্ডের ওপর আগের মতো আর অতটা নজর রাখতে পারছে না।

দু'জনের মাঝখানে হঠাৎ একটা স্পেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

ডাক্তার রায় থামলেন। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কিন্তু এখানেই আমি আমার ইনভেস্টিগেশন থামাইনি। বলা ভাল আমি থামলেও আমার মন থামেনি। এরপরেও আমি আর একটা কাজ করি। আরও একটু এগিয়ে যাই।'

কথাকলি ভুরু কুঁচকে বলে, 'কী কাজ?'

'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, সত্যি কি যন্ত্র ছাড়া প্রকৃতির বিপর্যয় আগে থেকে আঁচ করা সম্ভব? সাধারণ কৌতূহলেই কথাটা আমার জানতে ইচ্ছে করে। মানুষ যে পারেনা জানি, কিন্তু অন্য কেউ? অন্য কোনও প্রাণী কি পারে? ভয়ঙ্কর কোনও বিপদের কথা আগাম জানতে পারে? তার শরীরের মধ্যে এমন কোনও রসায়ন কি আছে যা প্রকৃতির সঙ্কেত বুঝতে সক্ষম? আমি খোঁজ শুরু করি। বেশ কয়েকটা জায়গায় মেলও পাঠাই।'

কথাকলি নড়েচড়ে বসে। এই কারণেই তার বাবাকে নিয়ে তার এত গর্ব হয়। মানুষটা শুধু সাধারণ একজন ডাক্তার নয়, তার থেকেও অনেক বেশি। এমনভাবে সমস্যার গভীরে ডুব দিতে ক'জন পারে? কিন্তু সমস্যার ভেতরে তার ঢুকলে চলবে না। বরং বাবাকে বের করে আনতে হবে। বাড়ি বসে যা খুশি করুক। কিন্তু এই দুর্বল শরীর নিয়ে কলকাতার বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না।

সুদর্শন রায় বলে যেতে থাকেন। যেন নিজেই নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

'কলি সবাই যে আমার মেলের উত্তর দেয় তা নয়। উইটওয়াটার স্ট্যান্ড ইউনিভার্সিটি যে উত্তরটা আমাকে পাঠায় সেখানে ভূমিকম্পের কথা আছে। কিছু কিছু পশুপাখি আছে যারা ভূমিকম্পের বিপদ আগেই আঁচ করতে পারে। কী করে পারে তার ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু পারে। কিন্তু কেউই ঝড়বৃষ্টি বা আগুন নিয়ে আমাকে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানাতে পারল না। হঠাৎ সেদিন গোপালের মা বলল...।'

কথাকলি বাবাকে থামিয়ে দিল। আবার রাগি গলা ফিরিয়ে এনে বলল, 'আমি জানি গোপালের মা কী বলল। তুমি আমাকে বলেছ। ক'টা পিঁপড়ে দেখে বলল, বৃষ্টি হবে, ঝড় হবে। আর অমনি তুমি রাত জেগে আকাশে মেঘ খুঁজতে শুরু করে দিলে। তাই তো? বাবা, তুমি বরং একটা কাজ করো, আলিপুর ওয়েদার অফিসের ডিরেক্টরকে একটা চিঠি লেখ। সাজেশন দাও এবার থেকে তারা যেন স্যাটেলাইট, রাডার, কম্পিউটার ফেলে দিয়ে কয়েকটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে পোষে। অশিক্ষিত একজন রান্নার মাসির কথায় তুমি কীভাবে এতটা নেচে উঠলে আমি ভাবতেও পারছি না বাবা। গতকালের ঝড়বৃষ্টিটা যে হঠাৎ তৈরি হওয়া একটা থান্ডার স্ট্রম সেটা তো আজ খবরের কাগজে লিখেছে। নতুন কিছু নয়, এরকম তো হয়। প্রতি বছরই সময়ের আগে একটা দু'টো কালবৈশাখি হয়েছে। কলকাতায় গাছ পড়েছে, জল জমেছে, ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়েছে। আগে থেকে এগুলো বোঝা যায় না। হঠাৎ মেঘ জমে।'

'তা হলে পিঁপড়েরা বুঝল কী করে?'

প্রশ্নটা করে মুচকি হাসলেন ডাক্তার রায়। কথাকলি উঠে দাঁড়াল। অনেক হয়েছে। সে চোখ কুঁচকে বাবার দিকে তাকাল।

'তুমি কী বলছো ঝিলডাঙার ফুল নামের মেয়েটার মধ্যে পিঁপড়েদের ক্ষমতা আছে?'

'না তা বলছি না। বরং উল্টোটাই বলছি। বলছি নেই। মানুষ পোকামাকড় নয়। পোকামাকড়ের গুণ দোষ কোনওটাই তার শরীরে বা মনে থাকতে পারে না। আর সেটা কনফার্ম করতেই আমাকে ওই মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। তুই আমাকে আটকাস না কলি। আটকালে একটা ছোট মেয়ের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে। তুই ভাবিস না, গঙ্গা আছে।'

ডাক্তার রায় থামলেন। একটু হাসলেন। বললেন, 'এবার একটু কফি হবে নাকি মা? গোপালের মা কি আজও ফেরেনি?' কথাকলি বলল, 'কী করে বলব? আমি জানি না। পিঁপড়েরা জানে হয়তো। ঝড়বৃষ্টির ভয় দেখিয়ে দু'দিন বাড়তি ছুটি হয়ে গেলে অসুবিধে কী? যাই হোক, আমি তোমাকে কফি করে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, এখনই তোমার বানেরহাটে যাওয়া চলবে না। ক'টাদিন পরে যদি শরীর একেবারে ফিট হয় তখন ভাবব।'

কথাকলি ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

'কিছু বলবি?'

কথাকলি নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'না, বলব না।'

'কলি, এরমধ্যে ব্রতীন এসেছিল না?'

কথাকলি সামান্য চমকে উঠল। শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ। বলব বলব করেও তোমাকে বলা হয়নি।'

সুদর্শন রায় মমতা মাখা গলায় বললেন, 'ইটস ওকে মাই ডিয়ার। সব কথা যে আমাকে বলতে হবে তার কী মানে? ওর টেলিফোন নম্বরটা তোর কাছে আছে?'

কথাকলি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন?'

সুদর্শন রায় অন্যমনস্ক ভাবলেন, 'কটা বইয়ের দরকার। পিঁপড়ের ওপর বই। এই যে বইটা দেখছিস এটাও পোকামাকড় সংক্রান্ত। এখানেও পিঁপড়েদের সম্পর্কে অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমি নির্দিষ্ট করে ওদের ফেরোমন নিয়ে জানতে চাইছি। ফেরোমনের কেমিক্যাল কম্পোজিশন হয়তো ওদের কোনও একস্ট্রা সেনসেশনারি পাওয়ার দেয়। শুনেছি আমেরিকার পারডু আর উইসকানসিন ইউনিভার্সিটিতে এই বিষয়ে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। ইন্টারনেটে এগুলো সব ভাসা-ভাসা। আই নিড সামথিং ইন ডিটেইলস। বই দেখতে হবে।'

কথাকলি কঠিন গলায় বলল, 'ব্রতীন কী করবে? ও যে পিঁপড়ে বিশেষজ্ঞ এমন কথা তো জানতাম না বাবা।'

সুদর্শন রায় লজ্জা পেয়ে হাসলেন। বললেন, 'না না, সে কথা বলছি না। ও তো একটা সময় অদ্ভুত অদ্ভুত সব বইটইয়ের মধ্যে থাকত। নইলে এই বুড়ো বয়েসে আমাকে গিয়ে লাইব্রেরিতে বসতে হবে। তাই ভাবছিলাম, তোর কাছে যদি ফোন নম্বর...বা আসে যদি আবার...। থাক আমিই খুঁজে নেব।'

কফি বানাতে বানাতে কথাকলির মনে হল, সে নিজেও একটা পিঁপড়ে হয়ে যাচ্ছে। বিপদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

ছবি শান্তনু দে

হাত বাড়ালেই রাইমা।
খুচখাচ ঝামেলা, টুকটাক সমাধান।
একটু বন্ধুত্ব আর অনেকটা বিশ্বাস।
চিন্তা কীসের, আপনার
কাছে রাইমা আছে

আমার সমস্যা আমার বান্ধবীকে নিয়ে। ইদানীং দেখছি ও কেমন যেন পাল্টে গিয়েছে। আমরা দু'জন একই অফিসে চাকরি করি। একসঙ্গেই রোজ বাড়ি ফিরতাম। ফোনে, এসএমএস-এও রোজ কথা হত। কিন্তু এখন দেখছি, ও আমার সঙ্গে সেরকম একটা কথাই বলছে না। ফোন, এসএমএস করাও অনেক কমে গিয়েছে। আমার অফিস থেকে বেরনোর অনেক আগেই ও বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই ওর এই হঠাৎ পরিবর্তন মেনে নিতে পারছি না।

—মৌমিতা সেনগুপ্ত, বেহালা

আচ্ছা তোমার কোনও কথায় বান্ধবীর অভিমান হয়নি তো? যার কারণে ও এমন বিহেভ করছে! দেখো, আমি তো একজ্যাক্টলি বলতে পারব না, ও কেন এমন করছে! তুমি একটা কাজ করো, বান্ধবী যখন অফিসে থাকবে, তখন সরাসরি ওর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলো। জানতে চাও, তোমার কোনও বিহেভিয়ারে ও দুঃখ পেয়েছে কি না। তোমার সঙ্গে ও ডিসটেন্স কেন তৈরি করেছে, জিজ্ঞাসা করো। আমার মনে হয়, এটাই একমাত্র সলিউশন হতে পারে।

আমার সমস্যা হল, আমি রোজ দাঁত মাজি, তাও মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতগুলো আমার মোটামুটি পরিষ্কার এবং সাদা। কিন্তু এই দুর্গন্ধের জন্য কারওর সঙ্গে কথা বলতে খুব লজ্জা করে।

—মল্লিকা সাহা, বজবজ

তোমার সমস্যাটা খুব কমন। তুমি একজন ডেন্টিস্টকে দেখিয়ে নাও। কারণ মুখে দুর্গন্ধ নানা কারণে হতে পারে। তাই একবার চেক-আপ করিয়ে নেওয়াই ভাল। আর একটা কাজ করো। সবসময় মাউথ ফ্রেশনার ইউজ করবে তাতে মুখের দুর্গন্ধ অনেকটা কমবে।

আমার সমস্যা হল, হঠাৎ করে আমি খুব মোটা হয়ে গিয়েছি। তুমি প্লিজ বলে দেবে, ডায়েট এবং এক্সারসাইজের ব্যাপারে আমি কী নিয়ম ফলো করব?

—মন্দিরা রায়, সল্টলেক

তুমি ভাজাভুজি যতটা সম্ভব কম খাওয়ার চেষ্টা করবে। প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প করে খাবে। দিনে অন্তত একটা হলেও ফল খাও। ব্রেকফাস্ট কখনও স্কিপ করবে না। তবে ব্রেকফাস্ট হবে হেভি, লাঞ্চ-ডিনার হবে লাইট। শুতে যাওয়ার অ্যাটলিস্ট তিন ঘণ্টা আগে ডিনার করবে।

আমি ভীতু বলে সবাই আমায় খ্যাপায়। শুধু ভূতের ভয় নয়, যে কোনওরকম দায়িত্বের কাজ করতেই ভয় পাই। কী করে আমি এই ভয় কাটাব?

—সুরজিৎ রায়চৌধুরি, উত্তরপাড়া

আসলে তোমার মধ্যে কনফিডেন্সের অভাব রয়েছে। সেই কারণেই মনে হয়, তুমি যে কোনও কাজ করতে ভয় পাও। সাহস করে একবার নিজেকে এগিয়ে দাও সবার মাঝে। দেখবে ভয় কেটে গিয়েছে। কনফিডেন্স বাড়াও। টেনশন, হেজিটেশন এগুলো এক্কেবারে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। আর ভূত বলে কিছু আছে নাকি? ওসব ভেবে ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না। সাহস থাকলে সব ভয়কে জয় করা যায়।

প্রচুর পরিমাণে জল আর সবজি খাবে। এক্সারসাইজের ব্যাপারে বলব, প্রতিদিন নিয়ম করে মর্নিংওয়াক আর যোগা করো। পারলে কোনও জিমে ভর্তি হয়ে যাও।

আমার স্কিনে হোয়াইটহেডের সমস্যা দেখা দিয়েছে। কী করব?

—অজন্তা ভট্টাচার্য, হাওড়া

তুমি রোজ সকালে হালকা গরম জলে মধু মিশিয়ে খাবে। চেষ্টা করবে অয়েল ফ্রি প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে। ফেসওয়াশ দিয়ে দিনে দু'বার মুখ ধোওয়ার চেষ্টা করবে। ওটমিল ও দইয়ের একটা প্যাক স্ক্রাবার হিসাবে ব্যবহার করতে পার। জায়ফল বেটে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালেও উপকার পাবে।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ঠিকানায় লিখো—সেন সলিউশনস, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২

অনিবার্য কারণবশত এ সপ্তাহে
'ও কোকিলা' প্রকাশিত হল না।

জিও জিশান সে

দিওয়ালিতে জিভে শান,
তেড়ে খান মোগলাই-তন্দুর।
রিংকা চক্রবর্তী

কি, সবার পেট ভাল তো? না মানে, দুর্গাপুজোয় তো সবারই একটু কম-বেশি ভূরিভোজন হয়েছে—তাই একটু কুশল সংবাদ নিচ্ছি আর কী! আমার পেট তো আবার কোনও অকেশন মানে না। সুযোগ পেলেই হড়কে যায়! টাইট করে যে বাঁধব, তার উপায় আছে? ফাঁক পেলেই লুজ! এই তো ক'দিন আগে লক্ষ্মীপুজো গেল। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেল্লাই খাওয়াদাওয়া! আসলে কী জানেন তো, পুজো ইজ ইক্যুয়াল টু খাওয়া! কী আর করা যায় বলুন? লক্ষ্মীদেবীকে সন্তুষ্ট না করলেও তো মুশকিল। ইনি না হলে টাকাও দেবেন না, দেখা তো দূরের কথা! এবার আসছে ফাটা-ফাটির উৎসব। মানে কালীপুজোর কথা বলছিলাম। আর মাত্র একদিন বাকি। তারপরেই তো শুরু হবে বাজি আর দীপ জ্বালাবার পালা! আর যারা এই দীপাবলিতে হৃদয়ে ভালবাসার দীপ জ্বালাতে চান, তারা জলদি জলদি জ্বালিয়ে ফেলুন। সত্যি বলছি, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর হয় না!

পুজো মানে প্যান্ডেল হপিং, পুজো মানে যোগাযোগের উৎসব। কিন্তু খাওয়াদাওয়া বিয়োগ করে, পুজো বা প্রেম কোনওটাই সম্ভব নয়। তাই আরও একবার পেটপুজোর আয়োজনে খাদ্য সাম্রাজ্যে বেড়ুবেড়ু। তবে এবার আমরা হানা দেব মোগল সাম্রাজ্যে। হদিশ দেব মোগলাই খানার।

মোগলাই খাবার মানেই ইতিহাসের পাতা বেয়ে পিছনের দিকে হাঁটা। এই কুইজিনের সূত্রপাত মোগল আমল থেকে। সাধারণত মোগলাই খাবার একটু মশলাদার আর সুগন্ধযুক্ত হয়। শুধু কলকাতা নয়, গোটা দেশজুড়েই রয়েছে মোগলাইয়ের সাম্রাজ্য। তবে উত্তরভাগেই এই কুইজিনের প্রচলন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সে যাইহোক, ভাগ্যিস এমন একটা কুইজিন ছিল, না হলে তো অচেনা মশলা, ঢিমে আঁচ, আর খোশবাইয়ের নিখাদ প্রেমটাই দানা বাঁধার সুযোগ পেত না কোনওদিন!

মোগলাই কুইজিনের একটি বিখ্যাত আইটেম চিকেন কোর্মা। বিরিয়ানি, কাবাব তো আছেই, কিন্তু এই চিকেন কোর্মা খাদ্য দুনিয়ার যে কোনও ফুড ফেস্টে প্রথম পুরস্কার জিতে নিতে পারে নিঃসন্দেহে। চিকেন কোর্মা তাই হাজারো খাদ্যরসিককে মুগ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। নবাবি খানার মেজাজটাকে, আমরা এইভাবেই আপন করে নিয়েছি। একেই বোধহয় ফিউশন বলে!

কলকাতার মোগলাই রান্নার আর একটা মজা আছে। মুসলমান বাবুর্চিদের কেরামতি রাজার হেঁশেল থেকে বেরিয়ে পরিণত হয়েছে সুপারহিট পথচলতি খাবারে। রাজকীয় বর্ণে-গন্ধে-সুস্বাদে অভ্যস্ত হয়েছে কলকাতাবাসীর জিভ। কাবাব, কালিয়া, কোর্মা, বিরিয়ানি

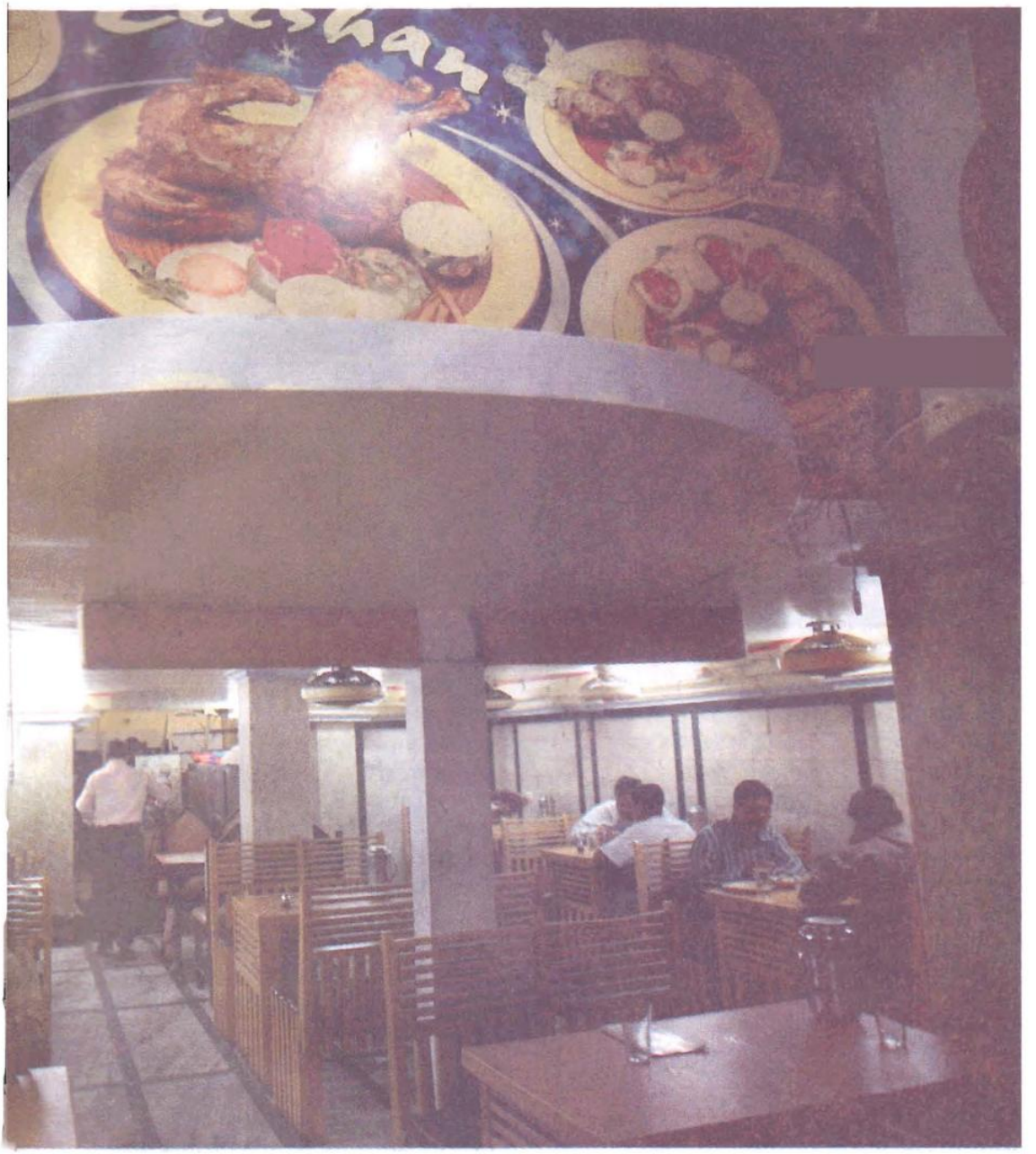

জিতে নিয়েছে ভেতো বাঙালির হৃদয়। আর তাই বঙ্গসন্তানরা ভিড় জমাচ্ছে বাবুর্চি পরিচালিত রেস্তোরাঁয়।

তবে একটা কথা কিন্তু সত্যি, বিরিয়ানি-কালিয়া-কোর্মা রাজকীয় আহার্য বটে, কিন্তু দামের দিক থেকে বেশ সস্তা। মোটামুটিভাবে গোটা শ'খানেক টাকা খরচ করলেই ভরপেট সুখাদ্যের জোগাড় হয়ে যাবে। আর অথেনটিক মোগলাই খানা খেতে হলে একবার অন্তত ঢুঁ মারুন পার্ক সার্কাসের 'জিশান'-এ। নিজেই টের পেয়ে যাবেন!

মূলত 'জিশান' বিরিয়ানির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু সাইড ডিশ হিসেবে এখানকার চিকেন কোর্মা কিন্তু এক নম্বরে থাকবে। যাঁরা 'জিশান'-এ এখনও পর্যন্ত খাননি, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা 'জিশান'-এর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা একবার মনে করে দেখুন তো, চিকেন কোর্মার কথা ভাবলে জিভে জল আসে কি না! আর যদি দামের দিকে নজর দেন, তা হলে তো মনটা আরও ফুরফুরে হয়ে যায়। ভাবুন তো একবার, এই বাজারে পঞ্চাশ টাকায় কী মেলে!

নয় নয় করে কলকাতা শহরের বুকে প্রায় দশ বছর কাটিয়ে ফেলল 'জিশান'। 'জিশান'-এর কর্ণধার বাহালুদ্দিন আহমেদ। ওঁর ছেলে সইফুদ্দিনও এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তবে রেস্তোরাঁর যাবতীয় দায়দায়িত্ব ম্যানেজার এ.সইদের কাঁধে। কলকাতায় 'জিশান'-এর তিনটে শাখা। একটা দেশপ্রিয় পার্কে, একটা

গড়িয়ায়, আর একটা চৌরঙ্গিতে—যার নাম 'নিউ জিশান'। তবে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা একমাত্র পার্ক সার্কাস আর গড়িয়ায়। দেশপ্রিয় পার্ক আর চৌরঙ্গিতে এই ব্যবস্থা নেই। ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, মোগলাই যা চান, যত চান পেয়ে যাবেন। দাম ও সাধ্যের মধ্যে। সুতরাং কোনওমতেই ধরাছোঁয়ার বাইরে নয় 'জিশান'।

এ শহরের প্রেম আছে সুস্বাদের সঙ্গে, ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় রয়েছে তার সাক্ষ্য। পিছন দিকে দু-এক পা হাঁটলেই টের পাবেন ক্রমশ সেই মিলিয়ে যাওয়া সুঘ্রাণের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছেন। তাই এই দিওয়ালিতে শান সে পা রাখুন 'জিশান'-এ। মন-পেট দু'টোই ভরুক সানন্দে।

এক প্লেট চিকেন কোর্মা বানাতে লাগবে

চিকেন—৫০০ গ্রাম
ডিম—৪ টে
টমেটো—১ টা
ঘি—১০০ গ্রাম
পেঁয়াজ—১ টা
হলুদ—১ চা চামচ
আদা বাটা—১ চা চামচ
রসুন বাটা—১ চা চামচ
শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো—১/৪ চা চামচ
কাজুবাদাম বাটা—১/২ চা চামচ
পেস্তা বাটা—১/২ চা চামচ
নারকেল বাটা—১ চা চামচ
গুঁড়ো গরম মশলা—১/৪ চা চামচ
ছোট এলাচ—২-৩ টে
দারুচিনি—২-৩ টে
জয়িত্রি—অল্প
জায়ফল—১ টা
মিষ্টি আতর—১ ফোঁটা
গোলাপজল—১ ফোঁটা
কেওড়ার জল—১ ফোঁটা
নুন—স্বাদমতো

এবার

প্রথমে মাংসটাকে এমনভাবে টুকরো করুন যাতে সেটার মধ্যে দু'টো লেগ পিস আর চিকেন ব্রেস্ট দু'ভাগে ভাগ করা থাকে।

এবার একটা কড়াইতে ঘি গরম করুন। ঘি গরম হলে একটা গোটা পেঁয়াজকে কুচিয়ে সেটা ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে ভাজতে থাকুন। বাদামি রং হলে চিকেনের পিসগুলো কড়াইতে দিয়ে ভেজে নিন।

পিসগুলোর রং লাল হলে তার মধ্যে আদা বাটা, রসুন বাটা, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে কষতে দিন।

কষা হলে কাজুবাদাম বাটা, পেস্তা বাটা, নারকেল বাটা দিয়ে আবার ওটা কষুন। এবার অল্প জল দিন। মাংসটা সিদ্ধ হলে গরম মশলা গুঁড়ো, দারুচিনি, জয়িত্রি, জায়ফল বাটা দিয়ে নাড়ুন।

এবার এটার মধ্যে আতর, গোলাপজল আর কেওড়ার জল দিয়ে দেওয়ার পর কড়াইয়ের মুখটা একটা ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দিন। কিছুক্ষণ পর একটা কাঁচা টমেটো চার ভাগে ভাগ করে দিন কড়াইয়ের মধ্যে। পাঁচ মিনিট পর চিকেন কোর্মা কড়াই থেকে নামিয়ে ফেলুন।

এরপর চারটে ডিম সিদ্ধ করে ভেজে নিন। এবার ওই চিকেন কোর্মা একটা পাত্রে রেখে ওই চারটে ভাজা ডিম তার ওপর সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

Approach Roads & Bridges

Multi-product SEZ's

Several Small & Medium Scale Enterprises

Health, Education & Residential Developments

Over 17 lakh job opportunities

Coming Soon

NKID
NEW KOLKATA INTERNATIONAL DEVELOPMENT
A City of New Opportunities

A City of New Opportunities

For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.

unitech
Dream. Believe. Create.

USE
Universal Success

Chowringhee Court, 4th Floor, 55 & 55/1, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071
033-40026160

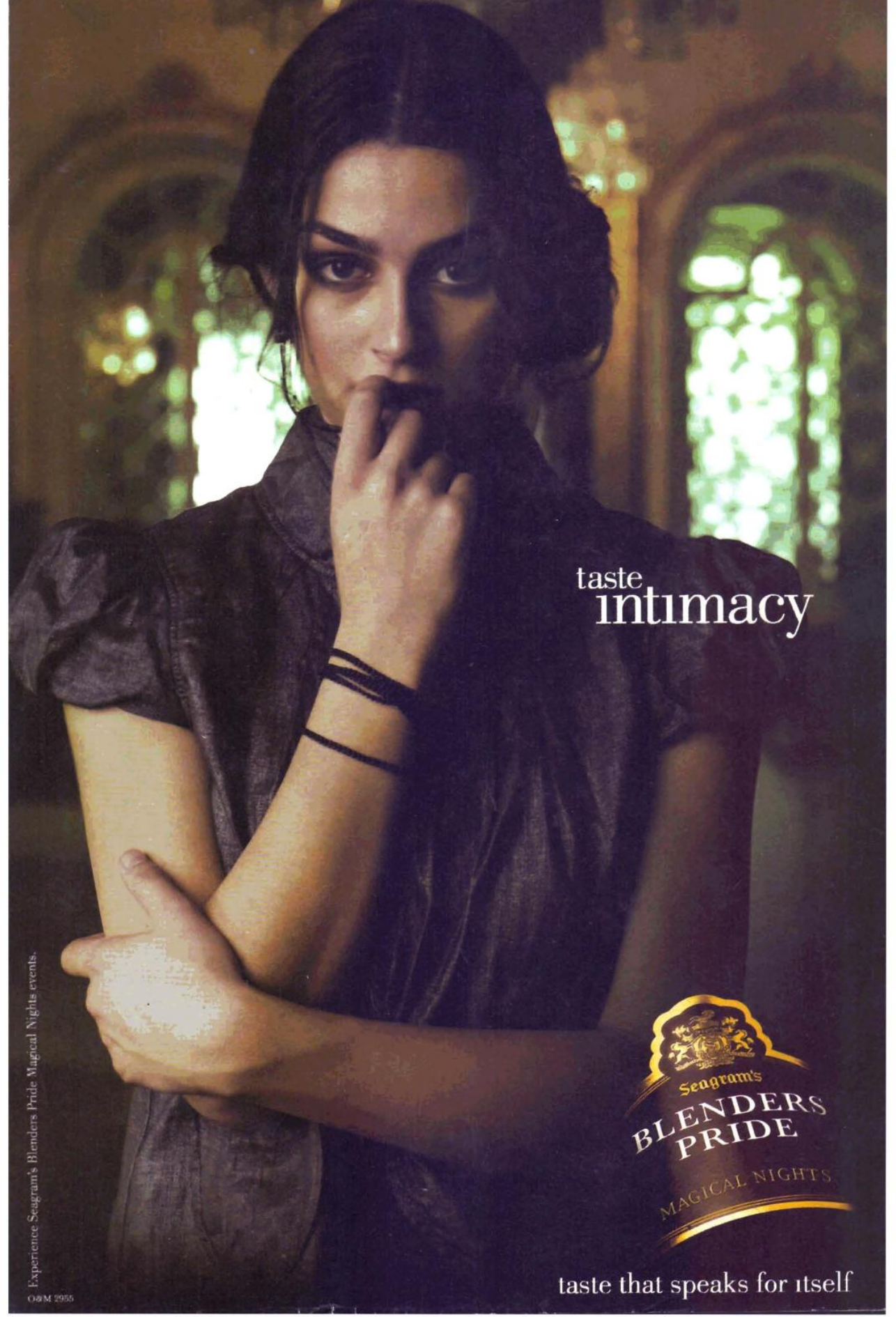
taste
intimacy
Seagram's
BLENDERS
PRIDE
MAGICAL NIGHTS
taste that speaks for itself
Experience Seagram's Blenders Pride Magical Nights events.
O&M 2955